আচার্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম পূজনীয়েষু—

যাঁর অপার স্নেহ-ভালোবাসা, প্রশ্রয় ও প্রেরণা

আমার জীবনের

দুর্লভ পাথেয়

সূচি

ছড়া : কামচারিতা কামরূপধারিতা

১.

ছড়া-প্রসঙ্গে কামচারিতা কামরূপধারিতার উল্লেখ প্রথম করেন রবীন্দ্রনাথ। সন ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে তাঁর 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া: ২' নামে সন্নিবিষ্ট হয়। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, সন ১৩০১ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত ছেলেভুলানো ছড়াগুলির রস-সৌন্দর্য ঐ প্রবন্ধে উদাহরণসহ প্রথম ব্যাখ্যাত হয়। এ বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথমেই 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে মুদ্রিত হয়। স্বভাবতই 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্তিত শিরোনামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পায়।

'ছেলেভুলানো ছড়া: ২' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি 'ভূমিকা'-যোগে তাঁর সংগৃহীত ৮১টি ছড়া 'ছড়াসংগ্রহ' সহ-শিরোনামে প্রকাশ করেন। 'ভূমিকা'-অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদে সংগৃহীত ছড়াগুলি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেন সেই মন্তব্য-সূত্রে 'কামচারিতা কামরূপধারিতা'-প্রসঙ্গের উল্লেখ ঘটে: 'ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা [dialect] লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো-একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না। কারণ, এই কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলি প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা অবশ্যক।' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৯০)।

ছড়ার পাঠান্তর-প্রসঙ্গে (এগুলি যেহেতু মুখে মুখে প্রচলিত, সেহেতু 'কথান্তর' বলাই শ্রেয়) রবীন্দ্রনাথ ছড়ার 'নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি' নির্দেশে 'কামচারিতা কামরূপধারিতা' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন। 'কামচারিতা'র অর্থ : কামনা-মতো আচরণের ক্ষমতা; 'কামরূপধারিতা'র অর্থ : কামনা-মতো রূপ ধারণের ক্ষমতা। অর্থাৎ, রূপান্তর বা পরিবর্তনশীলতা। একই ছড়ার একাধিক রূপান্তর যে দেখা যায় তাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির চারটি রূপের উল্লেখ করেছেন। তাঁর ছড়া সংগ্রহে 'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি' শীর্ষক ছড়াটির চারটি কথান্তর দেখা যায়। 'পানকৌড়ি পানকৌড়ি' দুটি রূপে পাওয়া যায়। 'খোকা যাবে নায়ে'-র কথান্তর লভ্য 'খোকো যাবে নায়ে' ছড়ায়। আবার 'ছেলেভুলানো ছড়া'-য় (পূর্ব-নাম : 'মেয়েলি ছড়া') আলোচিত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান' ছড়াটির কথান্তর পাই 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' প্রবন্ধের ছড়াসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট 'সুড়সুড়ুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান' ছড়াটিতে।

২.

রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত কয়েকটি ছড়ার কথান্তরের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে ছড়ার কামরূপচারী কামরূপধারী স্বভাবের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে :

ক. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি যেয়ো।
সরু সুতোর কাপড় দেব, ভাত রেঁধে খেয়ো॥
আমার বাড়ির জাদুকে আমার বাড়ি সাজে।
লোকের বাড়ি গেলে জাদু কোঁদলখানি বাজে॥
হোক কোঁদল ভাঙুক খাড়ু।
দু-হাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু॥
ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে।
পাড়ার ছেলেগুলো কেড়ে এসে খেলে॥
গোয়াল থেকে কিনে দেব দুদ্‌ওলা গাই।
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই॥
দুদ্‌ওলা গাইটে পালে হল হারা।
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা।
তাই দিয়ে জাদুকে ভোলা রে ভোলা॥ (ছড়া সংগ্রহ : ৫নং ছড়া)

খ. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো॥
শান-বাঁধানো ঘাট দেব, বেসম মেখে নেয়ো;
শীতলপাটি পেড়ে দেব, পড়ে ঘুম যেয়ো॥
আঁব-কাঁঠালের বাগান দেব, ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব, কাঁধে করে নেবে॥
দুই দুই বাঁদি দেব, পায়ে তেল দেবে।
উল্‌কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছ-পাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই॥ (ঐ : ৬নং ছড়া)

গ. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো।
সেজ নেই, মাদুর নেই, পুটুর চোখে বোসো॥
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥ (ঐ : ৭ নং ছড়া)

ঘ. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ি এসো।
খাট নেই, পালঙ্গ নেই, খোকার চোখে বোসো॥
খোকার মা বাড়ি নেই, শুয়ে ঘুম যেয়ো।
মাচার নীচে দুধ আছে, টেনেটুনে খেয়ো॥
নিশির কাপড় খসিয়ে দেব, বাঘের নাচন চেয়ো।
খিড়কি দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব, দুয়ারে বসে খেয়ো॥ (ঐ : ৫৯নং ছড়া)

ছড়াগুলি ঘুমপাড়ানি পর্যায়ের। শিশুকে ঘুম পাড়ানোই ছড়াগুলির উদ্দেশ্য। চারটি ছড়াই ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে সম্বোধন করে রচিত। বাটা ভরে পান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ছড়ায় শোনা যায়। কিন্তু পার্থক্যও কম নেই। প্রথম ছড়াটিতে কোঁদলের উল্লেখে ঘুমের পরিবেশটি যে বিঘ্নিত তাতে সন্দেহ নেই। ঠিক সেজন্যেই ছড়াটিকে এ-পর্যায়ের ছড়ার আদিরূপ হিসেবে গণ্য করা চলে না। জাদুর জন্য 'দুদ্‌ওলা গাই' কেনা, পালের মধ্যে গাইটির হারিয়ে যাওয়া — ইত্যাদি প্রসঙ্গও এ পর্যায়ের অন্য কোনও ছড়ায় পাই না। প্রথম ছড়ায় যেখানে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে 'আমার বাড়ি যেয়ো' বলে আহ্বান জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ছড়ায় সেখানে বলা হয়েছে: 'ঘুমের বাড়ি যেয়ো'। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে ঘুমের বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ কতখানি মনস্তত্ত্বসম্মত, সে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। 'আঁব-কাঁঠালের বাগান', 'চার চার বেয়ারা', 'দুই দুই বাঁদি', 'উল্‌কি ধানের মুড়কি', 'নারেঙ্গা ধানের খই', 'গাছ-পাকা রম্ভা', 'হাঁড়ি-ভরা দই' ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্মরণযোগ্য, 'পুঁটু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে' ছড়াটিতে (দ্র. 'ছেলেভুলানো ছড়া',) শাশুড়ি-ভোলানোর পন্থাসমূহের সঙ্গে এসমস্ত প্রতিশ্রুতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 'আঁব' (= আম) বা 'উল্‌কি' (=উড়কি) শব্দ আঞ্চলিকতার প্রভাবপুষ্ট। তৃতীয় ছড়ায় ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে; 'আমার বাড়ি এসো'। অবশ্য প্রথম ছড়ার 'জাদু' তৃতীয় ছড়ায় 'পুঁটু' নামে অভিহিত। সেজ-মাদুরের অভাবে ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসিকে পুঁটুর চোখে বসতে বলায় পুঁটুকে ঘুম পাড়ানোর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাটুকু রক্ষিত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে এ-ছড়ায় পাখিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। চতুর্থ ছড়ায় ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলা হয়েছে; 'আমাদের বাড়ি যেয়ো'। এ ছড়ায় 'পুঁটু'র পরিবর্তে পাই 'খোকা'-কে। খাট-পালঙ্কের অভাবে খোকার চোখে বসতে বলার অনুরোধ। বাড়িতে খোকার মায়ের অনুপস্থিতির উল্লেখ আর ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে শুয়ে ঘুম যাওয়ার বা দুধপানের নির্দেশে অবশ্য নতুনত্ব আছে। আলোচ্য ছড়াতেও ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি পাখিরূপে কল্পিত। দেখা গেল, কথান্তর প্রতিটি ছড়াকেই আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ছড়ায় বিশুদ্ধ বা আদিম পাঠ নির্ণয় করার উপায় নেই মনে করলেও আলোচ্য ছড়াগুচ্ছের প্রথম বা দ্বিতীয় ছড়ায় যে বিশুদ্ধ বা আদিম রূপটি বজায় নেই, তা হয়ত বলা চলে। প্রসঙ্গত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৯) উল্লিখিত মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: 'রবীন্দ্র-সংগ্রহে এই ছড়াটির চারিটি পাঠ গৃহীত হইয়াছে। বাংলার চারিটি বিভিন্ন অঞ্চলে যে এই চারিটি পাঠ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন্ পাঠটি কোন্ অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই। তথাপি মনে হয় চারিটি অঞ্চলের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান খুব বেশি নাই; কারণ, ইহাদের মধ্যে প্রায় বিশেষ অনৈক্য নাই। আরও মনে হইতে পারে যে, চারিটি ছড়াই ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষায় রচিত।' (পৃ ৮৫-৮৬)।

ড. ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে এ ছড়ার আরও পনেরটি কথান্তর উদ্ধার করেছেন (পৃ. ৮৮-৯৩)। যেমন, বর্ধমান জেলা থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় তিনটি পর্যায় দেখা যায়:

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা।
দুয়োরে ঘুম যায় দুটী মোগল পাতা।।
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায় রে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী।। (ঐ : ৫ নং ছড়া)

প্রথম পর্যায়ে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে আহ্বান ও আপ্যায়নের প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘুমকে আহ্বান। তৃতীয় পর্যায়ে আরও অনেকের সঙ্গে শিশু কন্যার ঘুমের চিত্র রচনা। চট্টগ্রাম জেলা থেকে সংগৃহীত আর একটি ছড়ায় রবীন্দ্র-সংগৃহীত চতুর্থ ছড়াটির প্রথম দুটি পংক্তির আঞ্চলিক রূপান্তর দেখা যায় :

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আঁয়ো বাড়ীত যাইও,
খাট নাই পালং নাই খোকার চোখের উয়র বইও। (ঐ : ১২ নং ছড়া)

শব্দ-প্রয়োগে আঞ্চলিকতাটুকু সহজেই চোখে পড়ে।

৩.

রবীন্দ্রনাথের ছড়া-সংগ্রহে বিভিন্ন পেশাজীবী সমাজে প্রচলিত একই ছড়ার রূপান্তরের উদাহরণ :

ক. খোকো যাবে মাছ ধরিতে, গায়ে নাগিবে কাদা।
কলুবাড়ি গিয়ে তেল নেওগে, দাম দেবে তোমার দাদা।। (ঐ : ৫০নং)

খ. খোকো যাবে মোষ চরাতে, খেয়ে যাবে কী।
আমার শিকের উপর গমের রুটি, তবলা-ভরা ঘি।। (ঐ : ৫২ নং ছড়া)

প্রথম ছড়ায় যে 'খোকো'কে পাই, সে যদি হয় মৎসজীবী সমাজের, দ্বিতীয় ছড়ায় যে 'খোকো'কে পাই, সে তা হলে কৃষিজীবী সমাজভুক্ত। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় ছড়ায় আর্থিক সচ্ছলতার পরিচয় লভ্য।

৪.

ছড়ার সম্প্রদায়গত রূপান্তরের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের ৭৭ সংখ্যক ছড়াটি বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত :

খোকোমণির বিয়ে দেব হটমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে।।
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে।
রুইমাছ পালঙ্গের শাক ভারে ভারে আসে।।
খোকোর দিদি কোণায় বসে বাছে।
কেউ দুটি চাইতে গেলে, বলে আর কি আমার আছে।।

ছড়াটিতে যুগপৎ রূপকথার জগৎ আর বাস্তব জগতের সহাবস্থান চোখে পড়ার মতো। বাঙালি মুসলমান-সম্প্রদায়ে প্রচলিত এ-ছড়ার একটি কথান্তরের উল্লেখ করেছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠায় :

নারগিসকে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে।
তারা গাই বলদে চষে।
তারা পায়ে টাকা ঘষে।।
এত টাকা নিমু না
নারগিসকে বিয়া দিমু না।।

ছড়াটি ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত। প্রথম ছড়ার 'খোকোমণি' দ্বিতীয় ছড়াটিতে হয়েছে 'নারগিস'; প্রথম ছড়ার 'হটমালার দেশ', দ্বিতীয় ছড়ায় 'উজানতলীর দেশ'-এ তে রূপান্তরিত। 'উজানতলীর দেশে' বলতে দেশের উজান অংশকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়

ছড়ার শেষাংশে পাই কন্যা-বিক্রয় প্রথার উল্লেখ। এ উল্লেখ কি ছড়াটির প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে না? বাঙালি মুসলমান-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছড়াটি রূঢ় রুক্ষ বাস্তবের স্পর্শযুক্ত। জননী-হৃদয়ের বেদনা মর্মস্পর্শী। তুলনায় বাঙালি হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছড়াটি কৌতুকরসাত্মক।

৫.

ছড়ার আঞ্চলিক পরিবর্তনও কম আকর্ষণীয় নয়। সুপরিচিত একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ার কথান্তর-সহায়তায় এই পরিবর্তনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় পাই :

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়াটির প্রচলিত একটি রূপ হলো :

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
টিয়া পাখী ধান খাইয়াছে খাজনা দিবে কিসে।।

ঐ একই অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াটির আর একটি রূপ হলো:

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে।।

পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াটি নিম্নরূপ :

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আ'ল দেশে।
টিয়ায় ধান খাইলে খাজনা দেবো কিসে।।

চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত রূপটি হলো :

আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গী এল দেশে।
চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।।

রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াটি চার পংক্তির :

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরুলো পান ফুরুলো খাজনার উপায় কি?
আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

ছড়াগুলি ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত (পৃ. ৭৬-৭৯)। তিনি অবশ্য আরো কয়েকটি কথান্তরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

বর্গী-হাঙ্গামা ঐতিহাসিক ঘটনা। আলিবর্দির শাসনকালে ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর ধরে পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে এ হাঙ্গামা ঘটে। বর্গী (ফারসী : 'বারগী') হলো অশ্বারোহী মারাঠা সৈন্য। এদের বারংবার আক্রমণে রাঢ় বাংলার বহু অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লুঠতরাজ অগ্নি-সংযোগ ও নির্বিচারে মানুষজনকে হত্যা করে তারা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। শস্য-ক্ষেত বিনষ্ট হয়, শস্য-গোলা লুন্ঠিত হয়, অসংখ্য গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়, বহুসংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে, আর এর ফলে সমস্ত বাংলা জুড়েই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়। আলিবর্দির প্রয়াস-প্রচেষ্টায় একসময় বর্গী-হাঙ্গামার অবসান ঘটে। কিন্তু আতঙ্ক আর অস্থিরতার সেই বছরগুলি লোকস্মৃতিতে অম্লান থেকে যায়। ছড়াগুলি সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। বর্গী-হাঙ্গামা

দমনে আলিবর্দির রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। তিনি অতিরিক্ত কর আদায়ে বাধ্য হন। খাজনার উল্লেখে তার ইঙ্গিত রয়ে গেছে।

বর্গী-ভীতি সে সময় এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে শিশুরাও বর্গীর ভয় পেতো। বর্গীদের উল্লেখ করে তাই শিশুদের ঘুম পাড়ানো হতো। ছড়াগুলি তার নিদর্শন।

উদ্ধৃত প্রথম ছড়ায় বুলবুলির ধান খাওয়ার প্রসঙ্গটি বাস্তবে সমর্থনযোগ্য নয়। খাজনাদানে অনিচ্ছাটুকুই সুকৌশলে প্রকাশিত। দ্বিতীয় ছড়ায় 'বর্গী'র বদলে পাই 'গরকী'র উল্লেখ। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষজন বর্গী-হাঙ্গামার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিল না। ছড়াটি পশ্চিম বাংলা থেকে লোকমুখবাহিত হয়ে ঐ অঞ্চলে প্রচার লাভ করে। অবশ্যই পরিবর্তিত আকারে। 'গরকী' শব্দের অর্থ সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রাবল্য দেখা যায়, এজন্যে এ-অঞ্চলের মানুষজনকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। 'গরকী'র ভয় দেখিয়ে তাই 'মণি'কে (প্রথম ছড়ার 'ছেলে' এ ছড়ায় হয়েছে 'মণি') ঘুম পাড়ানো হয়। টিয়াতে ধান খায়, অত্যন্ত বাস্তব ব্যাপার। প্রথম ছড়ার 'বুলবুলি' দ্বিতীয় ছড়ায় 'টিয়া'য় রূপান্তরিত। তৃতীয় ছড়ার দ্বিতীয় পংক্তিতে 'গুলগুলিয়ে' শব্দটি এসেছে প্রথম ছড়ার 'বুলবুলি'র ধ্বনি-সাদৃশ্যে। স্মৃতি-বিভ্রম হেতু 'বুলবুলি' হারিয়ে গেছে, ধ্বনির রেশ ধরে 'গুলিগুলিয়ে'র উদ্ভব ঘটেছে। চতুর্থ ছড়ায় 'মণি', 'বর্গী' ও 'টিয়া'র উপস্থিতি। পঞ্চম ছড়ায় 'বর্গী'র আগমনে ঘুমের আবাহন। 'চড়াই'-এর উপস্থিতি। ষষ্ঠ ছড়ায় 'বুলবুলি'র ধান খাওয়ার কথা পাই। সেইসঙ্গে পাই খাজনা পরিশোধের উপায় নির্দেশ ও অপেক্ষার কথা। দেখা গেল, অঞ্চল-ভেদে একই ছড়ার নানা রূপান্তর ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে সন্নিবেশিত একটি ছড়ার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় প্রচলিত একটি ছড়ার তুলনা-প্রসঙ্গে আঞ্চলিক রূপান্তরের আরও পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্র-প্রবন্ধভুক্ত ছড়াটি হলো :

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই।।
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে।।

ছড়াটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'দোলায় করিয়া ছয় পণ কড়ি গুনিতে গুনিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালু তটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে।' (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ৬৭৫)

'দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৯৯০) ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি এ-ছড়ার যে কথান্তর উদ্ধার করেছেন তাতে দেখা যায় :

আয় আয় রে টকামানে মাছ ধরতে যাবা,
মাছের কাঁটা পায়ে ভুঁকনে দলায় চাপি যাবা।
দলায় আছে ছ পণ কৌড় গুণতে গুণতে যাবা,
দু পণ কৌড় বেশী হিনে গাই-বাছুর কিন্‌বা।

গাই যায় নালে নালে, বাছুর যায় খালে,
এ গঙ্গার জলটুকু সে গঙ্গায় পড়ে
মাঝুগঙ্গার জলটুকু ঝিলিমিলি করে। (পৃ. ১৪৩)

প্রথম তিনটি পংক্তিতে পরিবর্তন নিতান্তই শব্দগত। 'ছেলের পাল' হয়েছে 'টকামানে' (= টোকামানে/অর্থ : ছেলের দল), 'ফুটল'-র বদলে পাই 'ভুঁকনে', 'দোলা' হয়েছে 'দলা', 'কড়ি' হয়েছে 'কৌড়'। 'হিনে' অর্থাৎ 'হলে'। শব্দের এই পরিবর্তন আঞ্চলিক প্রভাবজাত। শেষ তিনটি পংক্তি অবশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। ছড়াটির আলোচনায় ড. মাইতির মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : 'মাছ ধরতে গিয়ে যদি পায়ে কাঁটা ফোটে, তবে দোলায় করে যাত্রাই শ্রেয়। আর সেই দোলাতেই আছে ছ-পণ কড়ি। কড়ি গুণতে গুণতে যদি দু-পণ কড়ি বেশী হয়, তবে তাই দিয়ে একটা গাই আর বাছুর কিনে ফেলা যেতে পারে। গাই চলবে নালা-পথ দিয়ে আর বাছুর চলবে খাল পথ ধরে। এ গঙ্গার জল ও গঙ্গাতে গিয়েই পড়ছে। আর মাঝখানের গঙ্গার জল উঠছে ঝিলমিলিয়ে।' (পৃ. ১৪৪)।

দু-পণ কড়ি দিয়ে যে সমাজে একটা গাই আর একটা বাছুর কেনা যায়, সে সমাজ অত্যন্ত পুরনো বলেই মনে হয়।

৬.

কালগত রূপান্তরও দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' (অম্বিকামঙ্গল) কাব্যে শিশু শ্রীমন্তকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে খুল্লনা-কণ্ঠে যে ছড়াটি শোনা যায় তা হলো:

আয় রে বাছা আয় রে আয়। কি লাগি কান্দ কি ধন চায়॥
আনিব তুলিয়া গগন ফুল। একেক ফুলের লক্ষেক মূল।।
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাব হার। সোনার বাছা না কান্দ আর।।
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ। আনি দিব তোরে শরদ চান্দ।।
কপালে দিব সেই চান্দের ফোঁটা। খেলাতে দিব হাতে সোনার ভাঁটা।।
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখাব চুয়া। কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া।।
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া। দুই রাজার মেয়ে করাব বিয়া।।
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনদ নায়। কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন গায়।।
খাটে নিদ্রা যাবে চামর বায়। অম্বিকামঙ্গল মুকুন্দ গায়।।

ড. সুকুমার সেন মনে করেন, মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর সমসাময়িক লোকসমাজে প্রচলিত ঘুমপাড়ানি ছড়াকেই অল্পসল্প পরিবর্তনসহ তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। স্মরণযোগ্য তাঁর মন্তব্য : 'চারশ বছর আগেকার এক কবি তাঁর বৃহৎ রচনার মধ্যে তাঁর সমসাময়িক একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া-গান গেঁথে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে কবির কারুকার্যও কিছু আছে)'। ('লোক-সাহিত্যের ভাষা', পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, ১৯৭০, পৃ. ৭২)।

'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক : ১৩০২) বাঁকুড়া জেলার লোকসমাজ থেকে সংগৃহীত এ-ছড়ার কাল-পরিবর্তিত লৌকিক রূপটি মুদ্রিত হয় :

আয় রে আয়। কি নেগে কাঁদিস রে বাছা কি ধন চাই।।
খাওয়াইব খীরখণ্ড মাখাইব চুয়া। পাকা পান দিব সরেস গুয়া।।
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া। কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া।।
তুলে এনে দিব গগনফুল। একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল।।

সে মূলে গড়াব হার সোনার। আমার যাদু রে কেঁদ না আর।।

(ছেলেভুলানো ছড়া। বসন্তরঞ্জন রায়)

ড. সেনের মতে 'আধুনিক কালের নিরাভরণ সাজে' এ-ছড়ার আর একটি রূপান্তর হলো :

আয় আয় চাঁদা মামা টি দিয়ে যা। চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।।
মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেবো। ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো।।
রাঙ্গা সুতোর কাপড় দেবো। কালো গাইয়ের দুধ দেবো।।
দুধ খাবার বাটি দেবো। রাজার মেয়ে বিয়ে দেবো।।
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।।

৭.

ছড়ার রূপান্তর বা কথান্তরের আলোচনায় দেখা যায়, ছেলেভুলোনো ও খেলার ছড়াতেই রূপান্তর-কথান্তরের পরিমাণ বেশি। পূর্বোক্ত আলোচনায় ছেলেভুলানো ছড়ার বহুবিচিত্র রূপান্তর-কথান্তর আমাদের চোখে পড়েছে। খেলার ছড়াগুলি শিশু বা বালক-বালিকাদের মুখে কথিত হয়। তাদের কাছে ছড়ার সুর-ধ্বনিটুকুই বড়ো, শব্দ বা ভাষাগত বিশুদ্ধতা রক্ষায় তারা তেমন মনোযোগী নয়। খেলার আকর্ষণই মুখ্য, ছড়া খেলার অঙ্গ মাত্র। তাছাড়া ছোটদের স্মৃতির দুর্বলতাও কথান্তরের একটি প্রধান কারণ।

সুপরিচিত একটি খেলার ছড়ার দৃষ্টান্ত-সহায়তায় কথান্তরের বৈশিষ্ট্যটুকু নির্দেশ করা যেতে পারে। 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' প্রবন্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'আগ্‌ডুম বাগডুম' ছড়াটির চারটি রূপের উল্লেখ করেছেন। যেমন :

ক. আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে। ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি। ডুলি গেল সেই কম্‌লাপুলি।।
কম্‌লাপুলির টিয়েটা। সূয্যিমামার বিয়েটা।।
আয় রঙ্গ হাটে যাই। গুয়া পান কিনে খাই।।
একটা পান ফোঁপ্‌রা। মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল। ওরে খুকু গা তোল্।।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ— মাথায় কাপড় দে।।
হলুদ বনে কলুদ ফুল— তারার নামে টগর ফুল।।

খ. আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে। চাঁই মির্‌গেল ঘাঘর বাজে।।
বাজতে বাজতে প'ল ঠুলি। ঠুলি গেল কম্‌লাফুলি।।
আয়রে কম্‌লা হাটে যাই। পান গুয়োটা কিনে খাই।।
কচি কুমড়োর ঝোল। ওরে জামাই গা তোল।।
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে— কদমতলায় কে রে।।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ— মাথায় কাপড় দে রে।।

গ. আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে। লাল মির্‌গেল ঘাঘর বাজে।।
বাজতে বাজতে এল ডুলি। ডুলি গেল সেই কম্‌লাপুলি।।
কম্‌লাপুলির বিয়েটা। সূয্যিমামার টিয়েটা।।
হাড় মুড়্ মুড়্ কেলে জিরে। কুসুম কুসুম পানের বিঁড়ে।।
রাই রাই রাই রাকা।

হলুদ ফুলে কলুদ ফুল। তারার নামে টগ্‌গর ফুল॥
এক গাচি করে মেয়ে খাঁড়া। এক গাচি করে পুরুষ খাঁড়া॥
জামাই বেটা ভাত খাবি তো। এখানে এসে বোস্‌॥
খা গণ্ডা গণ্ডা কাঁটালের কোষ॥

ঘ. আগড়ম বাগড়ম ঘোঁড়াডম সাজে। ডান মেক্‌ড়া ঘাঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে পড়ল টুরি। টুরি গেল কম্‌লাপুরী॥

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৩) অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'ছড়া : হুগলী ভাস্তাযোড়া হইতে সংগৃহীত' শিরোনামে যে ছড়া-সংগ্রহ প্রকাশ করেন তাতে হুগলী অঞ্চলে প্রচলিত ঐ-ছড়াটির কথান্তরটি পাওয়া যায় :

আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে॥
লাল মেঘর, ঘাগর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি, ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা, সূর্যিমামার বিয়েটা॥
হাড় মড় মড় কেলে জিরে, রসুন কুসুম পানের বিঁড়ে॥
চল পিয়ারী হাটে যাই, হাটে যেয়ে কি খাই?
পান কোশাটা কিনে খাই।
একটি পান ফোঁপরা, দু-সতীনে ঝগড়া।
শাস্তের উপর ধেয়ে নাচে। জল তোলবার বয়স আছে।
দিনের ভাগে খায় কি?
কেলে গোরুর দুধ, তেল কুচ্‌ কুচ্‌ বেগুন ভাজা, কুচ্‌॥

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পূর্বোক্ত সংখ্যায় কুঞ্জলাল রায়ের 'ছড়া : বর্দ্ধমান-দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত' শীর্ষক সংগ্রহে যে কথান্তরটি পাওয়া যায় তা হলো :

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডান মিগড়ি ঘুঁগুর বাজে॥
বাজতে বাজতে পড়লো ঢুলি। ঢুলি গেল মোর কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা। সূর্যিমামার বিয়েটা॥
হাড় মড় মড় কাল জিরে। রসুন কসুন পানের বিঁড়ে॥
আয় লঙ্গ হাটে যাই। পান সুপারি কিনে খাই॥
একটি পান কোঁকড়া। মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
পান খাবি না খিলি খাবি। টোক্কা মেরে চলে যাবি॥
নাচ দুয়োরে ব্যাঙের কুটি। ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে একটি মুটি॥

ছড়াটির আরও অনেক কথান্তর পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। ছড়াটির আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন: "মূল পাঠ কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং মূল পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না। ইহাদের পরিবর্তনগুলিও কৌতুকাবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য। 'আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে'— এই ছত্রটির কোনো পরিষ্কার অর্থ আছে কিনা জানি না; অথবা যদি ইহা অন্য কোনো ছত্রের অপভ্রংশ হয় তবে সে ছত্রটি কী ছিল তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র বিবাহযাত্রার বর্ণনা। দ্বিতীয় ছত্রে যে বাজনা

কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠে কতই বিকৃত হইয়াছে।" (ছেলেভুলানো ছড়া : ২, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৯১)

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে সম্প্রসারিত করেছেন : 'কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও পল্লীজীবনের অভিজাত পরিবারের বিবাহের শোভাযাত্রা যুদ্ধযাত্রারই একটি অধঃপতিত (degenerated) রূপ মাত্র ছিল। কারণ, যখন সমাজে বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা (marriage by abduction) প্রচলিত ছিল, তখন যুদ্ধযাত্রা এবং বিবাহ-যাত্রায় কোনোও পার্থক্য ছিল না। সেইজন্য ছড়াটির প্রথম অংশে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যুদ্ধযাত্রা বর্ণনারই একটি আধুনিক পরিচয় মাত্র। মূলত ইহা যে একটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা ছিল, ইহার প্রথম পদটি অনুসরণ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।'

যেমন আগডুম অর্থ অগ্রবর্তী (advance guard) ডোম সৈন্যদল, বাগডুম অর্থাৎ বাগ বা পার্শ্ববর্তী ডোম সৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২২৮)।

তুলনায় ব্রতের ছড়াগুলিতে কথান্তরের পরিমাণ স্বল্প। কেননা, এগুলির আচারগত মূল্য রয়েছে। মন্ত্রধর্মী ছড়াগুলি যেমন, চোরবন্দীর ছড়া, হাতিবন্দীর ছড়া, সাপ-কাটার ছড়া, ডা'ন (ডাইনী) ছাড়াবার ছড়া, ভূত তাড়ানোর ছড়া ইত্যাদি কথান্তর বর্জিত। কারণ এ সমস্ত ছড়া মন্ত্ররূপে বিবেচিত হয়।

৮.

সত্য কথা বলতে কী, অল্পবিস্তর কথান্তর বা রূপান্তর লোকসাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই দেখা যায়। লোককথার কথান্তরকে আশ্রয় করে আবার একাধিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। জার্মানিতে জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রীম (১৭৮৫ - ১৮৬৩) ও উইলহেল্ম্ গ্রীম (১৭৮৬-১৮৫৯) দুই ভাই 'Kinder-Und Hausmarchen' নামে জার্মানির কৃষকসমাজে প্রচলিত লোককথা-সংকলনের প্রথম খণ্ডটি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ-সমস্ত লোককথার সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত লোককথার কথান্তর দেখা গেল। এই কথান্তর-সূত্রেই 'তুলনামূলক পদ্ধতি'র উদ্ভব। গ্রীম ভাইয়েরা মনে করেন জার্মান ভাষাতেই সমস্ত গল্প প্রথম সৃষ্টি হয়, তারপর ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে। ম্যাক্সমূলার (১৮২৩ — ১৯০০) আর থিওডোর বেনফে (১৮০৯— ১৮৮১) কিন্তু মনে করেন ইউরোপের অধিকাংশ লোককথার জন্মভূমি প্রাচীন ভারতবর্ষ। বেনফে জার্মান ভাষায় ভারতীয় পঞ্চতন্ত্রের যে অনুবাদ করেন তাতে 'পরিভ্রমণ তত্ত্ব' নামে একটি তত্ত্বের উল্লেখ করেন। এ তত্ত্বের মূল কথা হলো, লোককথা এক দেশ থেকে অন্যদেশে পরিভ্রমণ করে। একই ছড়াকেও তো কথান্তরসহ দেশের নানা প্রান্তে আমরা পরিভ্রমণ করতে দেখি। পরবর্তী কালে ফিনল্যাণ্ডের জুলিয়াস ক্রন (১৮৩৫ — ১৮৮৮) ও কার্লে ক্রন (১৮৬৩ — ১৯৩৩) পিতা ও পুত্র 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি'র কথা বলেন। বস্তুতপক্ষে তুলনামূলক পদ্ধতিরই তা রকমফের। এ পদ্ধতির মূল কথা হলো, লোককথা এক ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে আর এক ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে উপস্থিত হয়। এর ফলে কিছু পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে। লোককথা ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়। ভূগোলকে সামনে রেখে

লোককথার রূপান্তরের ইতিহাসটুকু অনুসন্ধানই 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি'র উদ্দেশ্য। 'ছেলেঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে' ছড়াটি যেভাবে বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে গিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে, 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি'তে তার ব্যাখ্যা নিশ্চয় করা চলে। সে যাই হোক, এ সমস্ত পদ্ধতির উপযোগিতা অবশ্য পরবর্তী কালে নানা কারণে হ্রাস পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে 'তুলনামূলক পদ্ধতি'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা তাঁর ছেলেভুলানো ছড়ার রূপান্তর সম্পর্কিত আলোচনায় বোঝা যায়। যদিও তিনি 'ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই' বলে ছড়ার মূল রূপটি (archetype) অন্বেষণে বিরত থেকেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ছড়াগুলির রসসৌন্দর্য আস্বাদনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাত্ত্বিক কোনও আলোচনা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

প্রবাদের বিশ্বে প্রেম

প্রবাদের সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। এগুলি অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী, সংক্ষিপ্ত ও সরস। অভিজ্ঞতাটা হল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। সংক্ষিপ্ত তাই স্মৃতি-সহায়ক। আর সরসতার জন্যে আকর্ষণীয়। প্রবাদ আপাততুচ্ছ, কিন্তু স্বরূপত গভীর।

প্রবাদগুলি অম্লমধুর। মিতভাষী কিন্তু মিষ্টভাষী নয়। ঈষৎ তির্যকতার পক্ষপাতী। প্রবাদে জীবনকে সোজাসুজি দেখা হয় না, কিছুটা ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখা হয়। প্রবাদের প্রেম সম্পর্কেও এ-কথা সত্য।

প্রবাদের নিরিখে প্রেমের লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে।

যথার্থ প্রেমের স্বরূপটি কেমন? তামিল প্রবাদ অনুযায়ী : 'দুই দেহ এক আত্মা।' যথার্থ প্রেমে প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মা ও হৃদয়ের ব্যবধান ঘুচে যায়। লাতিন প্রবাদেও পাই সেই ব্যবধানহীনতার উল্লেখ : 'Two Souls in one, two hearts into one heart.' প্রেমের বাঁধন ছিন্ন করা কঠিন : 'Tis hard to escape the bonds of love.'

প্রেম বাজারের পণ্য নয় : 'Love is not found in the market.'

প্রেম নেই কোথায়? প্রেমের অধিষ্ঠান সর্বত্র। প্রেম গরিবের কুঁড়ে ঘরেও থাকে, রাজপ্রাসাদেও থাকে : 'Love lives in cottages as well as in courts.'

প্রেমের অভাবে জীবন স্বাদহীন হয়ে ওঠে : 'Love is the salt of life.' সুইডিশ প্রবাদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রেমহীন জীবন গ্রীষ্মহীন বছরের মতো : 'A life without love, a year without summer.' ইউরোপের মানুষজনের কাছে গ্রীষ্মের দিনগুলি পরম আকাঙ্ক্ষিত। প্রেমও আমাদের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত।

অন্যদিকে প্রেম যে একধরনের দুর্বলতা তাও প্রবাদে গোপন থাকেনি : 'Love is the noblest frailty of the mind.' সোওয়াহিলি প্রবাদে তো প্রেমকে দেখা হয়েছে ব্যাধিরূপে। প্রেম এমন এক ব্যাধি যে ব্যাধির কোনও চিকিৎসক নেই : 'The disease of love has no physician.' প্রেম এমন এক ব্যাধি, যার কোনও নিরাময় নেই : 'Love's a malady without a cure.' কোনও ওষধি প্রেম নিরাময় করতে পারে না : 'No herb will cure love.'

প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ঈর্ষা ছাড়া প্রেম হয় না : 'Love is

never without jealousy'. যার ঈর্ষা নেই, সে আবার প্রেমিক নাকি? তার তো ভালোবাসাই নেই : 'The man who is not jealous in love, loves not'. (তামাসেক)।

কথায় নয়, কাজেই প্রেমের পরিচয় : 'Deeds are love, and not fine phrases'. (স্পেনীয়)।

প্রেম নীতি-নিয়মের ধার ধারে না : 'Love is without law'. অথবা বলা যায় : 'Love is lawless'. প্রেম যুক্তি মানে না : 'Love is without reason'. ফরাসী প্রবাদেও অনুরূপ ধারণার প্রকাশ : 'It is not reason that governs love'.

প্রেমের ব্যাপারে চোখের ভূমিকা কম নয়। আগে দেখা পরে প্রেম। প্রেম দর্শনসম্ভূত : 'Loving comes by looking'. রুশীদের অভিমত, চোখ থেকেই প্রেমের সূচনা : 'Love starts from the eyes'. লাতিন প্রবাদে চোখ হলো প্রেমের দূত : 'Eyes are the ambassadors of love'. প্রথম দর্শনে প্রেম— 'Love at first sight' এ তো পুরনো ব্যাপার! আরব দেশের প্রবাদেও তার সমর্থন : 'Sometimes love has been planted by one glance alone.' এক পলকের দেখা থেকেও প্রেমের জন্ম হয় বৈকি! আবার চারচোখের মিলনের গুরুত্বও কম নাকি? চারচোখের মিলনেই অন্তরে প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। একটি হিন্দি প্রবাদে এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে। পোলিশরা বলে, পুরুষের প্রেম আসে চোখের ভিতর দিয়ে, আর মেয়েদের প্রেম আসে কানের ভিতর দিয়ে : 'Love enters man through his eyes, woman through her ears'.

প্রেম গোপন থাকে না, গোপন রাখা যায় না। প্রবাদে তাই বলা হয়েছে : 'ক-দিন পিরীত থাকে ঢাকা'। অর্থাৎ, প্রেমের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। অপর একটি প্রবাদে বলা হয়েছে : 'পিরীত আগুন কাশ, রয় না অপ্রকাশ'। প্রেম, আগুন এবং কাশি অপ্রকাশ থাকে না, সহজেই প্রকাশ পায়। তুলনামূলকতার মাধ্যমে প্রেমের স্বরূপটি এখানে সরলভাবে উপস্থাপিত। অনুরূপ একটি ফরাসী প্রবাদ স্মরণযোগ্য : 'Love, smoke and a cough can not be hid'. জার্মান প্রবাদে ঐ সঙ্গে ঘামাচি এবং গেঁটে বাতের উল্লেখে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছে : 'Love, fire, the itch, a cough and gout are not to be concealed'. আরবের প্রবাদে অবশ্য দৃষ্টান্ত-চয়নে পার্থক্য দেখা যায় : 'Three things can not hide themselves : love, a mountain, and a man on a camel'. নরওয়েজিয়ান প্রবাদে পাই দারিদ্র্য প্রসঙ্গ : 'Poverty and love are hard to conceal'. রাশিয়ান প্রবাদে প্রেমের সঙ্গে ভয় ঐ তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত : 'Love and fear can not be hidden'. অন্যদিকে সিরিয়ার প্রবাদে বলা হয়েছে : 'Love and pregnancy and riding upon a camel can not be hid.' শুধু কী তাই? আসল কথাটি হলো, 'লুকিয়ে থেকে প্রেমকে লুকিয়ে রাখা যায় না'। যদিও একটি ইউরোপীয় প্রবাদে বলা হয়েছে : 'প্রেমের আনন্দ ক-দিন, গোপন থাকে য-দিন'।

প্রেম অন্ধ— 'Love is blind'. কেমন অন্ধ? না, প্যাঁচার চেয়েও বেশি : 'Never was owl more blind than a lover'. ইউক্রেনিয় প্রবাদে তো প্রেম এবং অন্ধত্বকে যমজ বোন বলা হয়েছে : 'Love and blindness are twin sisters'. আরবদেশের প্রবাদে প্রেম ও অন্ধত্ব দুই সঙ্গী : 'Love is the companion of blindness'. জার্মান

প্রবাদ শ্রেষ্ঠোক্তি : 'Love is not blind, it merely does n't see'. প্রেম-ভালোবাসা শুধু অন্ধ করে না, শ্রবণ প্রতিবন্ধীও করে : 'To love a thing makes the eye blind, the ear deaf'. (হিব্রু) বাংলা প্রবাদে উচ্চারিত হয়েছে যথার্থ কথাটি। প্রেমের ভাব না জানলে প্রেমিক হয় না। চোখ থাকতেও সে অন্ধ : 'চোখ থাকতে হয় রে কানা। যে জন প্রেমের ভাব জানে না'।

প্রেম অন্ধ, তাই : 'যদি পড়ে প্রেমের দায়, দেদো মাগীর এঁটো খায়'। সত্যি : 'Love sees no faults'.

প্রেম সহযোগিতাপ্রবণ। বৈপরীত্য-সহায়তায় প্রেমের ঔদার্যটুকু জ্ঞাপিত : 'পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দু'জন শোওয়া যায়। অপিরীতে মান পাতায় জায়গা না কুলায়॥' তুলনীয় আরবী প্রবাদ : 'Love can make any place argreeable'. বস্তুতপক্ষে প্রেমে কোনও অভাব থাকে না : 'In love there is no lack'.

প্রেম স্বপ্নপ্রবণ। প্রেমের জগতে অবিশ্বাস্যও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে : 'পিরীতের নাও পাহাড়ে চলে'। 'নাও' হলো নৌকা। অর্থাৎ, প্রেমের জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই : 'Who so loves believes the impossible'. হাঙ্গেরীয় প্রবাদেও সদৃশ উক্তি লভ্য : 'In dreams and in love nothing is impossible'. স্বপ্নে এবং প্রেমে সবই সম্ভবপর। একটি তামিল প্রবাদেও পাই : 'প্রেমে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে'। ইংরেজি প্রবাদ বলে : 'Love will go through stone walls'. প্রেম পাথরের দেওয়াল ভেদ করে চলে যায়। ইংরেজি প্রবাদের মতে, 'Love is free'– প্রেম স্বাধীন। খুব সত্যি কথা। মনে পড়বে, ইউরোপীয় সেই প্রবাদটি, যাতে উল্লেখ ঘটেছে প্রেমের জোয়ারের : 'Love has a tide'. প্রেমের জোয়ারে পিরীতের নৌকা যদি পাহাড়ে চলে, তবে বলার কী আছে?

জোর-জবরদস্তি করে আর যাই হোক, প্রেম হয় না। প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক আকর্ষণে ও আগ্রহেই প্রেমের উদ্ভব। প্রবাদ তাই জানিয়ে দেয় : 'পিরীত আর গীত জোরের কাজ নয়'। অথবা 'ধরে বেঁধে পিরীত, আর ঘষে-মেজে রূপ, দু'দিন পরে চুপ'। তুলনীয় ইংরেজি প্রবাদ : 'Love can not be compelled'.

প্রেমের আকর্ষণ এমনই তীব্র যে তা প্রেমের পাত্রপাত্রীকে ব্যাকুল করে তোলে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাকে ঘরছাড়া করে : 'সোনার কাঠি প্রেমের গান, শুনলে ঘরে রয় না প্রাণ'। এ আকর্ষণের স্বরূপটি ব্যাখ্যাত হয়েছে তামিল প্রবাদে : 'চুম্বকের যেমন ছুঁচকে টান, তেমনি হলো প্রেমের টান'।

প্রেমে পড়লে অসুন্দরীকে সুন্দরী বলে মনে হয়। তাই শুনি, 'পিরীতের পেত্নীও ভালো'; অথবা 'কুঁজি, না ঐ তো বুঁজি'। প্রেম যেখানে আছে, সেখানে আবার বাছাবাছির কী আছে : 'In love there is no choosing' (স্পেনীয়); পোলিশ প্রবাদেও এ-ধরনের মন্তব্য উচ্চারিত : 'When heart is in love, beauty is of no account. When one is asleep, a pillow is unnecessary'. আসলে 'ভালোবাসি যাকে, রূপের দেখি তাকে'। কেননা, প্রেম সমস্ত খুঁত ঢেকে দেয়। আরবদেশের প্রবাদ অন্তত তাই বলে : 'Love covers blemishes'. ইংরেজি প্রবাদেও অনুরূপ বিশ্বাসের প্রতিফলন : 'Love covers many infirmities' প্রেম বহু দৈহিক দুর্বলতাই আবৃত করে। তাই 'যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখলেও লাভ', 'যে যার সে তার'; 'মনে মনে মিল, তো লেগে গেল খিল'; 'জগতে ভালো কে? যার মনে লাগে যে'। তুলনীয় ইউরোপীয় প্রবাদ : 'If Jack's in

love, he's no judge of Jill's beauty'. জ্যাক যদি প্রেমে পড়ে, জিলের সৌন্দর্য বিচারের ক্ষমতা কি তার থাকে? ফরাসী প্রবাদেও অনুরূপ উক্তি শোনা যায় : 'Were you as black as a mulberry, you are white for him who loves you'. প্রেমিকা মালবেরী গাছের পাতার মতো কালো হলে কী হবে, তার প্রেমিকের কাছে সে শুভ্রবর্ণা; আর একটি ফরাসী প্রবাদে শুনি : 'One's-sweet heart is never ugly', হৃদয়রম্যা কখনো কুৎসিত হতে পারে না।

প্রেম মানেই দুঃখ, প্রেম মানেই কষ্ট, প্রেম মানেই যন্ত্রণা। এক প্রেমের হাজার দুরবস্থা : 'There are a thousand miseries in one love'. (কাশ্মীরী) বেশি ভালোবাসলেই বেশি কষ্ট পেতে হয় : 'He who loves much suffers much'. (পর্তুগীজ)। শ্রোভাকদের অভিজ্ঞতাও তাই : 'Whom you love most from him will you suffer the worst'. ভালোবাসার প্রকাশ তো কষ্টেরই প্রকাশ : 'He who exposes himself to love exposes himself to suffering'. (ব্রাজিলীয়)। বর্মীরা বলে, বেশি ভালোবাসায় বেশি আঘাত পেতে হয় : 'Great love, great resentment'. ভালোবাসা কাঁদায়। যে যাকে যত বেশি ভালোবাসে সে তাকে তত কাঁদায়। এই বোধহয় প্রেম-ভালোবাসার রীতি : 'He loves thee well who makes thee weep'. (স্পেনীয়) প্রেমের মাধুর্যের সঙ্গে চোখের জলও মিশে থাকে : 'The sweets of love are mixed with tears'. আর পুরনো প্রেম হল কয়েদখানা : 'An old love is a prison'. (লাতিন)।

প্রেমে যারা সুখের সন্ধানী, জাপানী প্রবাদ তাদের সতর্ক করে। ভাবখানা হলো : 'He who falls in love has come to the end of happiness'. প্রেমে যে পড়েছে, তার সুখ খতম হয়ে গেছে। স্পেনদেশীয় প্রবাদে বলে : 'Love kills happiness, hapiness kills love'. প্রেম বিনাশ করে সুখ, সুখ বিনাশ করে প্রেম।

প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে'। তামিল প্রবাদের বক্তব্য বাংলা তর্জমায় দাঁড়ায় : 'দুরন্ত প্রেম তুরন্ত শীতল হয়'; বস্তুত পক্ষে প্রেমের পরিণতি হল বিচ্ছেদ : 'প্রেমের পাক বিচ্ছেদে'। প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্পর্ক অদ্যতন নয়, আদ্যতন।

মৃত্যুর চেয়ে প্রেম বেশি শক্তিশালী : 'Love is stronger than death' (ফরাসী)। 'যাক্ জীয়তি থাক পিরীতি' প্রবাদেও তাই বলা হয়; 'জীয়তি' অর্থাৎ জীবন।

প্রেম নির্ভীক : 'There is no fear in love, but perfect love caseth out fear'. (বাইবেল)। বোহেমীয় প্রবাদও আমাদের সাহসী করে তোলে : 'Love drives out fear'.

কোনও কোনও প্রবাদে প্রেমের প্রশস্তিকীর্তনও শোনা যায়। যেমন, প্রেমের রাজ্যে অস্ত্রের আস্ফালন নেই। তরবারি ছাড়াই প্রেম তার রাজ্য শাসন করে : 'Love rules his kingdom without a sword'.

প্রেম যে-কোনো লোককে কাজের যোগ্য করে তোলে : 'Love makes one fit for any work'. ভালোবাসা থাকলে কোনও কাজই ভার বোধ হয় না : 'ভালোবাসার নেইক ভার'। তুলনীয় : ইংরেজি প্রবাদ— 'Labour is light where love doth pay'.

প্রেম যেখানে থাকে সেখানে কোনও পাপ থাকে না : 'Where there is love there is no sin'.

প্রেমে কোনও কিছুই কঠিন মনে হয় না : 'Nothing is difficult to one in love'. (লাতিন)।

স্লোভাকীয় প্রবাদ বলে, প্রেম হল মধুর বন্দীত্ব : 'Love is sweet captivity'.

কোনও প্রেমই মন্দ নয়, কোনও কয়েদখানাই ভালো নয় : 'No love is foul, no prison fair'.

যথার্থ প্রেম কখনও ভাঙে না : 'True love does not break' (শিখ)।

যে হৃদয় ভালোবাসে, সে হৃদয় সবসময় নবীন থাকে : 'The heart that loves is always young'. (মনটেনেগ্রিন)।

সুন্দর বলেই কোনও কিছুকে আমরা ভালোবাসি না, বস্তুতপক্ষে আমরা ভালোবাসি বলেই তা সুন্দর হয়ে ওঠে : 'Not what is beautiful is loved/ rather what is loved is beautiful'. (গ্রীক) তাই দেখা যায়, যাকে আমরা ভালোবাসি, সে অস্নাত হলেও তাকে ফর্সা দেখি : 'He whom we love is white even when unwashed'. (রাশিয়ান)।

প্রবাদে প্রেম ও বোকামি সমার্থক : 'Love and foolishness differ from each other only in name'. অথবা 'Tis impossible to love and be wise'. লাতিন প্রবাদের ধারণা : 'When in love even Jupiter is an ass.' প্রেমে পড়লে খোদ জুপিটারও গাধা বনে যান। জুপিটার হলেন দেবরাজ! স্বয়ং দেবরাজের যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা যে শোচনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। প্রেম যতজনকে নায়ক বানিয়েছে তার চেয়ে বোকা বানিয়েছে অনেক বেশিজনকে : 'Love has made heroes of many and fools of many more'. (সুইডিশ)।

রুশীদের ধারণা, সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে প্রেম ও ক্ষিধে : 'Love and hunger are the foundation stones of all things'. ইংরেজি প্রবাদ জানায়, প্রেম এবং ক্ষিধে পৃথিবী শাসন করছে : 'Love and hunger rule the world'. জার্মান প্রবাদ কিন্তু মনে করে, প্রেমের চেয়ে ক্ষিধের শক্তি বেশি : 'Hunger is stronger than love'. লাতিন প্রবাদেও তার সমর্থন মেলে : 'Without corn and wine love grows cold'. মোদ্দা কথা হলো, দানাপানি ছাড়া প্রেম শীতল। রুটি আর লবণের অভাবে প্রেম উধাও হয় : 'Without bread and salt love cannot exist'.

লাতিন প্রবাদে পাই : 'Love begets love', প্রেমই প্রেমের কারণ। ফরাসী প্রবাদ বলে, প্রেমেই প্রেমের শুরু : 'Love begins with love'. অন্যদিকে ইংরেজি প্রবাদে বলে, প্রেমের শুরুটা ভালো, কিন্তু শেষটা ভালো নয়। প্রেমের প্রথম পর্যায়ে প্রেম সুমিষ্ট ঠেকে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার মিষ্টত্ব অম্লত্বে পরিণত হয় : 'Love is sweet in the beginning but sour in the ending'. পর্তুগীজ প্রবাদ অবশ্য প্রেমের তিলমাত্র ভালোত্ব স্বীকার করে না : 'Love, love, the beginning is bad and the end worse'. অর্থাৎ : প্রেম, প্রেম, তার শুরুটা বিচ্ছিরি আর শেষটা যাচ্ছেতাই।

প্রেমের ভিয়েন তিরস্কার, তিরস্কার ছাড়া প্রেম জমে না। তিরস্কারবিহীন প্রেম প্রেমই নয় : 'Love is without rebuke is no love'. বাইবেলের উক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বলতে হয়, গোপন প্রেমের চেয়ে প্রকাশ্য তিরস্কার ভালো : 'Open rebuke is better than secret love'. এ-বিষয়ে চীনা প্রবাদে একটি সার কথা বলা

হয়েছে : 'Rebuke yourself as you rebuke others; love others as you love yourself'. অন্যদের যেভাবে তিরস্কার করো, নিজেকে সেভাবে তিরস্কার করো; নিজেকে যেমন ভালোবাসো, তেমনি অন্যদের ভালোবাসো।

আর রাগ? রাগ প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি প্রেমকে নতুন করে তোলে : 'The anger of lovers is the renewal of love'. স্মরণযোগ্য ইতালীয় প্রবাদ : 'Anger increases love'. রাগ প্রেম বাড়িয়ে দেয়। রাগে প্রেম উজ্জ্বল হয়। রাগ ছাড়া কি প্রেম হয়? না হয় না : 'In love anger is always lying' (লাতিন)।

প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক খুব নিকট সম্পর্ক। জার্মান প্রবাদে বলা হয়েছে যে, প্রেমের সঙ্গে ঘৃণার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক : 'Love and hate are blood relations'. তাই যে ঘৃণা করতে পারে না, সে ভালোবাসতেও পারে না : 'He who cannot hate cannot love'. (জার্মান) মহৎ ঘৃণা থেকেই মহৎ ভালোবাসার জন্ম : 'Great love is followed by great hate'. লাতিন প্রবাদেও প্রেম ও ঘৃণার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি নির্দেশিত হয়েছে : 'Love as though you might hate; hate as though you might love'. যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে আঘাত করাও যায়। রাশিয়ান প্রবাদে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে : 'Whom I love I beat'. অর্থাৎ শাসন করা তারই সাজে যে সোহাগ করে। আরব দেশের প্রবাদে একটি নারীকে কেন্দ্র করে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত : 'They wooed her and she resisted; they neglected her and she fall in love'. তাকে জয় করার চেষ্টায় সে বাধা দিল, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করায় সে প্রেমে পড়ল। হাউসার একটি প্রবাদে বলা হয়েছে, নিজেকে ভালোবাসো, অন্যেরা তোমাকে ঘৃণা করবে, নিজেকে ঘৃণা করো, অন্যেরা তোমাকে ভালোবাসবে : 'Love yourself, others will hate you; hate yourself, others will love you'.

বিয়েকে বাদ দিয়ে কি প্রেমের আলোচনা হতে পারে? কখনোই নয়। ইংরেজি প্রবাদ বলে, প্রেমের যদি দেখা পেতে চাও, তবে আগে বিয়ে করো : 'Marry first and love will follow'. এস্কিমো প্রবাদও তা সমর্থন করে : 'Love comes after marriage'. ফিনিশীয় প্রবাদে প্রেম হল কুসুম, তার ফল হল বিয়ে : 'Love is a flower which turns into fruit at marriage'. জার্মানদের বিশ্বাস, অল্প বয়সের বিয়েতে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় : 'Early marriage, long love'.

প্রেমে অনেক কিছুই হয়, কিন্তু অর্থে সবকিছুই হয়। ফরাসী প্রবাদে সেরকমই বলা হয়েছে : 'Love does much, money everything'. প্রেম করতে হলে রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন। রৌপ্যমুদ্রার এমনই মায়াবী আকর্ষণ যে তাতে প্রেমের দেখা মেলে : 'Little silver – much love'. (ইংরেজি)। প্রেম মানে অর্থের অপচয় এমন উক্তিও প্রবাদে লভ্য। যেমন : 'পিরীত কর, কুরীত কর, কেবল মনঃকষ্ট। সাঙাত কর, সখী কর, কেবল টাকা নষ্ট'। আর একটি প্রবাদে টাকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটি এভাবে নির্দেশিত : 'টাকা তুমি যাও কোথা? পিরীত যথা। আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে'।

ফরাসীরা বলে চিরন্তন প্রেম বলে কিছু নেই : 'There is no such thing as eternal love'. জার্মানরা মনে করে, চিরন্তন প্রেম চিরন্তন মিথ্যা : 'Eternal love–Eternal lie'. বাংলা প্রবাদে নারী ও পুরুষের কথোপকথনের ছলে ভালোবাসা সম্পর্কে শ্লেষতীক্ষ্ণ মন্তব্য করা হয়েছে : 'ভালোবাসো কেমন? ভালোবাসো যেমন'। গ্রীকদের বিশ্বাস আবার ঠিক

উল্টো : 'He is not a lover who does not love forever'. চিরকালের জন্যে যে ভালোবাসে না সে প্রেমিকই নয়। স্কচদের ধারণা, প্রেম ও সঙ্গীত ছাড়া আর সবকিছুই বিলুপ্ত হবে : 'Everything will perish save love and music'. পর্তুগীজ প্রবাদ বলে, সেই ভালোবাসাই ভালোবাসা, যে ভালোবাসা ভালোবাসার জনকে ভোলে না : 'He loves well who never forgets'. প্রেম বিচ্ছিন্নতা সহ্য করে না : 'Love alone does not tolerate partness'. (বুলগেরীয়)।

প্রেমই প্রেমের যথার্থ পুরস্কার : 'Love is the true reward of love'. প্রেম তো প্রেমেরই প্রত্যাশী। যেখানে সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়, সেখানে প্রেম সফল হয়, সার্থক হয়।

প্রসঙ্গত নতুন প্রেমের লক্ষণটি নির্দেশ করা যেতে পারে। নতুন প্রেমে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ গভীর ও তীব্র হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে প্রবাদে তাই বলা হয়েছে, 'নূতন পিরীতে বড়ো আঠা'। প্রবাদে শব্দ ব্যবহার নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে লাভ নেই।

প্রেমের প্রথম পর্যায়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উদ্দামতার অন্ত থাকে না : 'পিরীত যখন জোটে, ফুটকড়াই ফোটে'। অন্যদিকে প্রেমের অবসানে থাকে অবজ্ঞা ও পীড়ন : 'পিরীত যখন ছোটে ঢেঁকিতে ফেলে কোটে'।

'গলায় গলায় পিরীত' বলতে বোঝায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অন্যদিকে 'চিঁড়ে-কাঁচকলার পিরীত' বললে উল্টোটাই বোঝায়। চিঁড়ের সঙ্গে পাকাকলাই জুতসই। কাঁচকলা বেমানান।

প্রেমে প্রতারিত হবার ভয় পদে পদে। প্রবাদ তাই নানাভাবে সতর্ক করতে চেয়েছে। কপট প্রেমের স্বরূপটি প্রবাদে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে : 'কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু বুকে ছুরি'। অথবা, 'মুখে ভালো, মনে দড়, খাওয়া-দাওয়া নেই পিরীত বড়'। খল বা শঠের পিরীত নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী : 'জলের রেখা খলের পিরীত'। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, নিধুবাবুর গানের পঙক্তি : 'শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন'। রাম বসুর উক্তিতে শুনি : 'যেমন খলের পিরীত বালে জলের রেখা'। আর গোপাল উড়ের মন্তব্য : 'শঠের পিরীতখানি জলের লিখন'। অপর একটি প্রবাদে বালির বাঁধের সঙ্গে শঠের প্রীতির তুলনা করা হয়েছে : 'বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি, এই দুইয়ের একই রীতি'। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী।

শুধু শঠের প্রেমই যে ক্ষণস্থায়ী তা নয়, বড়োর প্রেমও তাই : 'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ'। প্রেম-সম্পর্ক সমানে সমানে স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত বিত্তের, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার। অসম সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শঠ ও অশঠের প্রেমের পার্থক্য আছে। 'ভালোর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙলে বানান যায়। খলের পিরীত মাটির বাসন, ফাটলে ফেলায়'। মাটির বাসন ভাঙলে জোড়া লাগানো যায় না, কিন্তু সোনার বাসন জোড়া লাগানো যায়। খলের পিরীত যেন মাটির বাসন, আর ভালোর প্রেম সোনার বাসন। উপমার যাথাযথ্য প্রশংসাযোগ্য। স্মরণযোগ্য, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কৃষ্ণের প্রতি বড়ায়ির ভর্ৎসনা : 'যে পুনি আধম জন অন্তরে কপট। তাহার যে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট'। (রাধাবিরহ : ৬৭ সংখ্যক পদ)। অর্থ : অন্তরে কপটজনের স্নেহ (প্রেম) মাটির ঘটের মতোই ক্ষণভঙ্গুর। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ : 'সুজন-পিরীত সোনা, ভেঙে গড়া যায়। কুজন-পিরীত কাচ, ভাঙলে ফুরায়॥' সুজন ও কুজনের প্রেমের সঙ্গে সোনা ও কাচের তুলনা সুসঙ্গত। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে পাই : 'সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে'। (রাধাবিরহ : ৩৬ সংখ্যক পদ)। অর্থ : সোনা ভাঙলে আগুন-তাপে জোড়া যায়।

পুরুষের ভালোবাসায় প্রবাদে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে : 'পুরুষের ভালোবাসা মোল্লার মুরগী পোষা'। পুরুষের ভালোবাসা স্বার্থ-প্রণোদিত, কপট। পুরুষের ভালোবাসার প্রতি এক্ষেত্রে তাই অবজ্ঞাই প্রদর্শিত। বায়রনের উক্তি মনে পড়ে যায় : 'Man's love is of man's life a thing apart, 'Tis woman's whole existence'. পুরুষের কাছে প্রেম একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মাত্র; কিন্তু মেয়েদের কাছে তা নয়। প্রেমের সঙ্গে তাদের সমগ্র অস্তিত্বের যোগ।

ভালোবাসার পরিমাণ-সামঞ্জস্যের ওপর নির্ভর করে ভালোবাসার ভালো-মন্দত্ব : 'ভালোবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুন। কম হলে লাগে ঝাল, বেশি হলে পোড়ে গাল।।' পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাবেই যত ব্যাঘাত, যত বিড়ম্বনা।*

---

* বাংলা প্রবাদগুলি সহজেই বোঝা যাবে। ইংরেজি ভাষাশ্রয়ী যে-সমস্ত প্রবাদের পাশে কোনো দেশের উল্লেখ নেই, সেগুলি ইউরোপ মহাদেশে প্রচলিত।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিবাদ

প্রবাদ-প্রবচন নেই কোন সমাজে? সব সমাজেই আছে। প্রবাদ-প্রবচন হলো এমন একধরনের উক্তি, যা বহুলপ্রচলিত। আকারে সংক্ষিপ্ত, প্রকারে সরস, সুদীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী। আপাততুচ্ছ, কিন্তু স্বরূপত গভীর উক্তি।

সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্রবাদ-প্রবচনগুলির মূল্য অপরিসীম। সমাজতাত্ত্বিক এগুলিতে সমাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। খুঁজে পান বহুবিধ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, বঞ্চনা-বেদনা, ক্ষোভ-অসন্তোষ, অসংগতি, শ্লেষ ও ধিক্কারের চিহ্ন।

প্রতিবাদী মানসিকতার প্রতিফলনও বহু প্রবাদ-প্রবচনে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে যে সমাজকে অচল অনড় জড় বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সমাজ যে সজীব সচল তা প্রচলিত এই সমস্ত প্রবাদ প্রবচন থেকে বেশ বোঝা যায়। চলমান সমাজকে যেন এগুলিতে আবিষ্কার করা যায়। সে সমাজ সজাগ সচেতন সমালোচনাপ্রবণ ন্যায়নিষ্ঠ ও বজ্রকণ্ঠ। সমস্ত রকম অন্যায়-অবিচার আতিশয্য ও নীতিহীনতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। সে সমাজ পৌরুষদীপ্ত, খড়্গপাণি। অভিভাবকের মূর্তিতে তার আবির্ভাব। বাঙালি সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলির সহায়তায় এর যাথার্থ্য প্রমাণ করা যেতে পারে।

বিচার-ব্যবস্থায় অবশ্য কাম্য ন্যায়পরতা। আদর্শ বিচার-ব্যবস্থায় দোষীর শাস্তি হয়, নির্দোষ অব্যাহতি পায়। যে বিচার-ব্যবস্থায় বিচারের নামে প্রহসন চলে, সে বিচার-ব্যবস্থা নিন্দাযোগ্য। বিচার হবে আইনসম্মত। বিচারের নামে আইন লঙ্ঘিত হলে সে বিচার হবে অবিচারেরই নামান্তর মাত্র। আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী শাস্তিযোগ্য, অবশ্য তার অপরাধ প্রমাণ হওয়া চাই। বিনা অপরাধেই কারো শাস্তি হলে বিচার-ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাই সমর্থিত হয়। উপযুক্ত বিচার ছাড়া কেউ শাস্তি পেলে সে শাস্তি ন্যায়নীতির পরিপন্থী রূপেই গণ্য হবে। বিচারের আগে কাউকে কখনো শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। সে জাতীয় বিচার বিচারব্যবস্থার শৈথিল্যের পরিচয়ই বহন করবে। 'আগে ফাঁসি পরে বিচার' প্রবাদ বাক্যটি যার নিদর্শন। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তিদানের অন্যায় বিচারও দেখা যায়। যেমন . 'দই খেলেন রমাকান্ত, বিচারের বেলায় গোবর্ধন।' এও প্রতিবাদযোগ্য।

আমাদের স্বার্থপরতাও প্রবাদ-প্রবচনে ধিক্কারযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন 'আদর কাজের বেলা, তারপর অবহেলা'। প্রয়োজনে যার দ্বারস্থ হই, খাতির যত্ন করি, প্রয়োজন শেষ হলে তাকে ভুলে যাই, অবজ্ঞা করি। বেশ বোঝা যায়, এক্ষেত্রে আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ নেহাতই স্বার্থতাড়িত। প্রকৃত কৃতজ্ঞতার অভাব আছে। এ ধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, প্রতিবাদযোগ্য।

সংসারে ছিদ্রান্বেষীর অভাব নেই। অপরের ছিদ্রান্বেষণেই একশ্রেণীর মানুষের আনন্দ। এরা অসূয়াপরায়ণ। মজার ব্যাপার, নিজেদের স্খলন পতন দুর্বলতা সম্বন্ধে এরা অসচেতন। প্রবাদ-প্রবচনকে অবশ্য এরা ফাঁকি দিতে পারেনি। ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ হতে হয়েছে— 'আপন ছিদ্র জানে না পরের ছিদ্র খোঁজে'। স্মরণযোগ্য সেই প্রবাদটি : 'ছুঁচ বলে চালুনি তোর পিছে কেন ছ্যাদা'। ইংরেজি প্রবাদে পাই : 'The pot calls the Kettle black'. অন্যায় অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ছিদ্রান্বেষীদের ধিক্কার জানানো হয়েছে। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হলো : 'আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি'। তথাকথিত এইসব সমালোচকদের উদ্দেশে তাই বলতে হয় 'নিজের চরকায় তেল দাও'। যার ইংরেজি ভাষান্তর : 'Paddle your own canoe'. এরা অন্যের সমালোচনা করে, কিন্তু আত্মসমালোচনায় পরাঙ্মুখ। অনধিকার চর্চায় এদের প্রবল উৎসাহ। অনুরূপ 'আপনার মুখ আপনি দেখ', 'আপনি নেঙাই পরকে ভেঙাই' কিংবা 'আপনি বড়ো ভালো তাই পরকে বলে কালো' প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিবাদের সুর স্পষ্টগোচর।

কর্মবিমুখ অলস স্বভাবের মানুষজনের সংখ্যা এ-সমাজে কম নয়। নৈষ্কর্ম এদের পীড়া দেয় না। অক্ষম অপদার্থ এসব মানুষজনকে বিদ্রূপের কশাঘাতে সচেতন করার চেষ্টা দেখা যায় প্রবাদ-প্রবচনে : 'এক কড়ার মুরদ নাই ভাত মারবার গোঁসাই'। কিংবা 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই' প্রবাদটিও এ-সূত্রে স্মরণযোগ্য।

আর একদল মানুষ আছে, যারা খাবার বেলায় অত্যন্ত তৎপর, কিন্তু কাজের ব্যাপারে অনাগ্রহী, প্রবাদে তারা তিরস্কৃত হয়। যেমন : (১) 'কাজে কম খাইতে যম।' (২) 'কাজের বেলা ভাগে, খাবার বেলা আগে।' (৩) 'খাবার বেলায় মস্ত হাঁ, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা।' (৪) 'ছেলে ধর তুমি ভাই, আমি তোমার ভাত খাই।' (৫) 'খাইবার সময় বারো ভাই, পোয়া লইবে কেউ নাই।'

আমাদের পরিচিত জীবনে অসংগতির সীমা নেই। আচরণগত অসংগতি স্বভাবতই তাই প্রবাদ-প্রবচনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বৃদ্ধবয়সে যখন কেউ বিয়ে করতে চায়, তখন তার আচরণে কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই প্রকাশ পায়। সমাজ এজন্যে তাকে তিরস্কার করে : 'এককালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে/তবু আবার করবে বিয়ে'। অথবা 'বুড়ার বিয়ে, আমকাঠ আর ঝাঁটা দিয়ে।'

'ডুবে ডুবে জল খাওয়া' আমরা পছন্দ করি না। এ ধরনের আচরণের বরং নিন্দাই করে থাকি। 'একাদশীর ঠাকুরানী ডুব দিয়ে খান পানি' প্রবাদে তাই ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত। হিন্দু সমাজে একাদশীতে বিধবারা নিরম্বু উপবাস করে থাকেন। অন্তত শাস্ত্রবিধি সেরকমই। এ অবস্থায় প্রকাশ্যে উপবাসী থেকে স্নানের সময় কৌশলে তৃষ্ণা নিবারণ করলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত হয় বলেই ঐ সমাজের বিশ্বাস। সন্দেহ নেই, সমাজের বিধি-বিধান বড় নির্মম, অমানবিক। যে সমাজে শাস্ত্রাচারের প্রবল কঠোরতা, সে সমাজে এমন মানসিকতা স্বাভাবিক।

নিরম্বু উপবাসে এভাবে জলপানের ব্যাপারটি নীতিবিরুদ্ধ মনে হতেই পারে, সেজন্যে ভর্ৎসনাও করা যেতে পারে। আমাদের বিবেচনায় অবশ্য সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। শাস্ত্রাচারের এই ভয়াবহতা আজকের দিনে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্রবাদটির গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের রক্ষণশীলতার পরিচয় বহন করে চলেছে এ প্রবাদ। সেদিক থেকে এর দলিলমূল্য অনস্বীকার্য।

অধিকারবোধ আছে, কিন্তু দায়িত্ববোধ নেই। এমন অবস্থা কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু এমন অবস্থা তো ঘটে। প্রবাদ-প্রবচন সেক্ষেত্রে সরব হয়ে ওঠে : 'এতদিন ছিল না খোঁজ-খবর/ভাগের বেলা এলে জোর-জবর'। স্বার্থসর্বস্বতার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ এখানে।

এ সমাজে মা-মাসির প্রতি দায়িত্ব স্বীকৃত। অন্নবঞ্চিতা মা-মাসির দুরবস্থায় সমাজ তাই সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে : 'এ মা, ও মাসি, তবে কেন উপবাসী'। সমাজ উপবাসপীড়িতা মা-মাসির পক্ষ নেয়, মা-মাসির প্রতি কর্তব্যে অবহেলায় রুষ্ট হয়, সমালোচকের ভূমিকা নেয়। এহেন অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে। 'মা বেচে খায় কলমী শাক' প্রবাদে পুত্রের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত। প্রবাদ অত্যন্ত রূঢ় সমালোচক।

এ সমাজ ভয়াবহ পণপ্রথার শিকার। সাধারণত পাত্রপক্ষই কন্যাপক্ষের কাছ থেকে পণ গ্রহণ করে থাকে। পণ আদায়ের নামে অত্যাচার-উৎপীড়নও ঘটে। নিম্নোক্ত প্রবাদে কন্যার পিতার অসহায়তা চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের পিতার অর্থ-লোলুপতাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে : 'কনের বাপ ব'সে ব'সে চোখের জলে ভাসে/বরের বাপ ব'সে আছে পাঁচশ' টাকার আশে।।' পাঁচশ' টাকার উল্লেখে বোঝা যায় প্রবাদটি বেশ পুরনো। যে সমাজে প্রবাদটির উদ্ভব সে সমাজে পাঁচশ' টাকার অর্থমূল্য অকিঞ্চিৎকর ছিল না। আবার যে সমাজে পাত্র কন্যাকে পণ দেয় সে সমাজে কন্যার মায়ের মায়াকান্নাও তিরস্কৃত হয় : 'কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুটলি বাঁধে।' প্রবাদ সমদর্শী।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি পার্থিব ব্যাপারে উদাসীন। অর্থলোলুপ তিনি হতে পারেন না। কলিকালের ব্রাহ্মণদের আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে তাই প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয় : 'কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান/আপনি ত মজে আর মজায় যজমান।।' অনুরূপ দৃষ্টান্ত : 'বামুন দক্ষিণা ধরে/ঢেঁকির নামে পূজা করে'।

মুন্সী-মোল্লারাও রেহাই পান না। তাঁদের আদর্শহীনতারও সমালোচনা করা হয় : 'কলিকালের মুন্সী মোল্লা নামে হবে দড়/না মানবে কোরান-কেতাব হুজ্জুৎ করবে বড়।।' প্রতিবাদ আস্ফালনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক প্রায়শই বিরূপতার সম্পর্ক। সংসারের কর্ত্রীত্ব নিয়ে সদ্য-যৌবনার সঙ্গে বিগত-যৌবনার বিরোধ ঘটে। এ বিরোধে পুত্রেরও একটি ভূমিকা আছে। শাশুড়ির ধারণা, পুত্র পুত্রবধূর পক্ষে। পুত্রের স্ত্রৈণতা তাই উপহসিত হয় : 'কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই/গিন্নির পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই'। অথবা : 'মা মরেন দোষ নেই, বউ বাঁচলে বাঁচি'। পুত্রের প্রতি মায়ের যতই টান থাকুক না কেন, পুত্রের টান স্ত্রীর প্রতি : 'মা মরে পুতের লাগি/পুত মরে বউয়ের লাগি'। সমসূত্রে স্মরণযোগ্য : 'কি করবে পুতে/নিত্য সে ত কানভাঙানির কাছে যায় শুতে'। লক্ষণীয়, সদ্যযৌবনার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কথাই প্রবাদটিতে বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, শাশুড়িতন্ত্রই এ সমস্ত প্রবাদের উৎসে।

সংসারে অপদার্থ স্বামীরও অভাব নেই। সেক্ষেত্রে স্বামীর অপদার্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় : 'কাজের নাম নাই, বউ কিলানোর যম'। নিষ্কর্মা স্বামীর প্রতি সমাজের প্রবল অবজ্ঞাই এভাবে প্রকাশিত হয়। সমসূত্রে স্মরণযোগ্য 'ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারবার গোঁসাই' প্রবাদটি। দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর বর্বরতা প্রবাদটিতে ধিকৃত।

নানাবিধ ভড়ং-ভণ্ডামি এবং তার প্রতিবাদও চোখে পড়ে বৈকি! 'কুকুর মারে ত হাঁড়ি ফেলে না', 'ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের তরে কান্না', 'ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়/চালকুমড়া কেন বাকি রয়', 'গরু মেরে জুতো দান' প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচন যার দৃষ্টান্ত। কুকুর হাঁড়ি (মাটির) উচ্ছিষ্ট করলে হাঁড়িটি নষ্ট-করাই বিধেয়, তার বদলে হাঁড়িটি রক্ষা করে কুকুরকে শাস্তি দিলে ক্ষোভের খানিকটা উপশম ঘটলেও হাঁড়ির শুদ্ধতা বজায় থাকে না। মনকে চোখ ঠারাই হয়। এভাবে হাঁড়ির শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা ভণ্ডামি ছাড়া আর কী! ঘরের মায়ের জন্যে যেখানে চিন্তার লেশমাত্র নেই, পরের মায়ের জন্যে কান্না সেখানে কতখানি আন্তরিক তাতে সন্দেহ রয়েছে। মাতৃভক্তির যাথার্থ্যেই সংশয় জাগে। ভস্মলেপনে সন্ন্যাসীত্ব নেই, সন্ন্যাসীত্বের পরিচয় রয়েছে সন্ন্যাসীর মানসিকতায়। ভস্মলেপন বাহ্যাচার মাত্র। যথার্থ সন্ন্যাসীর এসব বাহ্য ভড়ংয়ের প্রয়োজন নেই। গো-হত্যা করে জুতো দানের মধ্যে কোনও পুণ্য নেই। গো-হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাতে হয় না। এই প্রদর্শনধর্মিতার কোনও মূল্য নেই। বক্তব্যের দিক থেকে প্রবাদ-প্রবচনগুলির আবেদন যে জোরালো তা স্বীকার করতেই হয়।

'গাছে গরু চরাণ, মুখে ধান শুকান' যে বাক্যবাগীশ প্রবাদ-প্রবচন তার শত্রু। 'গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়' যে সুবিধাবাদী, প্রবাদ তারও শত্রু। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' যে, প্রবাদ তার হামবড়াইপনার তোয়াক্কা করে না, বরং অবজ্ঞাই করে। প্রবাদ জানিয়ে দেয় : 'গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভালো'। কারণ কসাইয়ের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ্য, কিন্তু গোঁসাইয়ের তা নয়। গোঁসাই চতুর ও কৌশলী। তার কার্যকলাপ অমানবিক। অযোগ্যকে উপহাস : 'ঘট গড়তে পারে না, মেটের বায়না চায়'। 'মেটে' অর্থাৎ মাটির কলসী। অনুরূপ আর একটি প্রবাদ : 'ছুঁচ গড়তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়'। বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধিতা : (১) 'ঘরে নেই অন্তরম্ভা, বাহিরেতে কোঁচা লম্বা'। (২) 'ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি'। (৩) 'ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত'। (৪) 'ঘরে ভাত নেই, দোরে চাঁদোয়া'। (৫) 'পেটজ্বলে ভাতে, সোনার আংটি হাতে'। (৬) 'ঘরে নেই ভাত, জমিদারী ঠাট'। (৭) 'হাতে নাই কড়ি, নাম বাড়াছে সদাগরি'। (৮) 'ঘরে নেই ভাত, দুয়ারে বাজে ঢাক'। (৯) 'ঘরে নেই চাউল পাত, চড়িয়ে দে ঘি-ভাত'। (১০) 'ঘরে নেই ধান এক সালি, আড়াই হাত মরাই তুলি'। (১১) 'ঘরে শুধু শাক-সজনা, বাইরে তবু বাবুয়ানা'। 'সজনা' অর্থাৎ সজনে শাক। সহজলভ্য সজনে শাক একমাত্র খাদ্য। তার বাবুয়ানা কি শোভা পায়? নির্লজ্জতাকে আক্রমণ : 'চোখের চামড়া নেই'। প্রতিবাদ কপটতার বিরুদ্ধে : 'মুখে খুব মিঠে, নিম নিসিন্দা পেটে'। প্রতিবাদ কাজ ভণ্ডুলকারীর বিরুদ্ধে : 'কাম নাই কাম করে, ধান চাইলে এক করে'। দেয় সামান্যই নেয় বেশি, প্রবাদ তাকেও ছেড়ে কথা কয় না : 'দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে দশগুণ'। মা মেয়ের জন্যে ব্যাকুল হলে কী হবে, মেয়ে মায়ের জন্যে ভাবে না, তার ব্যাকুলতা স্বামীর জন্যে : 'মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে'। স্ত্রৈণের আচরণও প্রতিবাদের লক্ষ্য : 'গরু ছাগল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার'। আদিখ্যেতা দেখলে প্রতিবাদ জানাতেই হয় : 'ঘর নেই দুয়ার বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্য কাঁদে'। গৃহিণীর অনাচারও

প্রতিবাদের বিষয় হয়ে ওঠে : 'ঘর বাসি দোর বাসি, গিন্নি করেন পঞ্চগ্রাসী'। ঘরের লোককে পর করে, পরকে আপন করতে যে ব্যাকুল হয় তার মতো অবিবেচক আর কে আছে? প্রবাদ এই অবিবেচনার প্রতিবাদী : 'ঘর যে সে হয় পর, পর যে সে হয় ঘর'। অনুরূপ প্রবাদ : 'ঘরের ধন ফেলে পরের ধন আগলান'। অযোগ্যের আস্ফালন কি বরদাস্ত করা যায়? না বোধহয়। এক্ষেত্রেও প্রতিবাদ করতে হয় : 'চন্দ্রসূর্য অস্ত গেল জোনাকির পোঁদে বাতি, বাঘ পালাল বেরাল এল ধরতে এবার হাতি'।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এমন অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে স্বভাবে যেগুলি প্রতিবাদধর্মী। আর এই প্রতিবাদধর্মিতা আমাদের সমাজের সুস্থতা ও সজীবতাই প্রমাণ করে। যে সমাজ প্রতিবাদবিমুখ, সে সমাজ নিষ্প্রাণ, মৃত, জড়। সৌভাগ্যের কথা, আমাদের সমাজ সম্পর্কে সে অভিযোগ করা চলে না।

ঝুমুর গানের নায়িকা

'ঝুমুর' আদিরসমুখ্য প্রেমের গান। এ গান দেহসম্পৃক্ত। নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণ এ-গানে প্রাধান্য পায়।

আদিতে রক্ত-মাংসের বাস্তব নারীই ছিল ঝুমুরগানের নায়িকা। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে নায়িকার স্থান গ্রহণ করেন শ্রীরাধা। সূক্ষ্ম বিচারে অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার সঙ্গে ঝুমুর গানের নায়িকার প্রভেদটুকু গোপন থাকে না। বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধিকা হ্লাদিনী-স্বরূপা, ভাবরসময়ী। অন্যদিকে ঝুমুর গানের নায়িকা উক্তিতে-আচরণে, বিশ্বাসে-সংস্কারে গ্রামবাংলার প্রাকৃত রমণী। ভাব-বৃন্দাবন তার অধিষ্ঠানক্ষেত্র নয়।

বাস্তব জগতের এই নারীটির ক্রমবিকাশের খানিকটা আদল-আভাস যেন ঝুমর গানগুলিতে পাওয়া যায়। একটি গানে দেখা পাই এক ষোড়শীর, পরিপূর্ণ নারীরূপটি যার অবিকশিত। প্রণয়-সম্ভোগের বিচিত্র কলাকৌশলই যে তার অনায়ত্ত তাই নয়, প্রণয়-সম্ভোগে তার অনিচ্ছাও যথেষ্ট! গানটিতে সেই অনিচ্ছারই প্রবল প্রকাশ :

> ফুলেতে বসো না ভ্রমর ফুলের মধু দিব না
> ষোল বছর বয়স নাগর এ কলঙ্ক লিব না।
> ফুলের কুঁড়ি আমি বঁধু যৌবনে হাত দিও না
> তোমার চুম্বন বঁধু আমি সহিতে পারিব না।
> আধফুটা কলিতে অলি কেন কর কামনা।
> বড় হলে সময় এলে পুরাব তোমার বাসনা।[১]

নায়কের আচরণের বিরুদ্ধে এ-গানে নায়িকার প্রতিবাদ ধ্বনিত, কিন্তু সে প্রতিবাদের সঙ্গে রয়েছে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, সম্ভোগ-মিলনের আগাম প্রত্যাশা।

নিম্নোক্ত গানটিতে অবশ্য অবস্থা পরিবর্তিত। নায়িকা দেহমনে পরিপূর্ণ বিকাশপ্রাপ্তা। তার যৌবনজ্বালা বাস্তবসম্মত। কামনা-বাসনায় সে এখন মর্ত্য-রমণী। এ-নায়িকা মিলনব্যাকুলা :

> চোখে চোখে ইশারাতে আর মনের কথা বলি তোমাকে,
> রসিক যে জন বুঝবে সে জন আমার মনের বেদনা।

ও হ্যমাব যৌবন জ্বালা বড জ্বালা বঁধু বিঁধেছে মদনা।।
কলি জানে অলিব মবম আব অলি জানে ফুলেব বেদন
তুমি বিনা কে বুঝিবে আমাব বেদনা হে—
ও আমাব যৌবনজ্বালা বড জ্বালা বঁধু বিঁধেছে মদনা।[২]

প্রাত্যহিক পবিচিত জগতেব এই নায়িকা বক্ত মাংসেব মানবী সত্তায় আবির্ভূতা। অন্য একটি গানে নায়কেব আচরণেব বিরুদ্ধে নাযিকার যে আপত্তি প্রকাশ পায় তাতে নায়কেব নির্লজ্জতা শ্লেষ বিদ্রূপে ধিকৃত। নায়ক তাব আঁচল ধবে পথবোধ কবে দাঁড়ালে নায়িকা রুষ্ট হয, ভৎসনায সবব হয়ে ওঠে

দেখ ত লিজ্জলকে
ঘিরেই আছে পথকে
দিব না দিব না আমি পবেব দখলকে।
মানা কবত তব খলকে
(যেন) নাই ধবে আঁচলকে [৩]

এ নাবী গ্রাম্য নারী কলহপবাযণা, কটুভাষিণী। এমন একাধিক গানে অভিযোগকাবিণী নাযিকাব আবির্ভাব ঘটে। তাব অভিযোগেব ভাষাতে পাই প্রাকৃত নাবীব পবিচয। প্রেমিকেব বিরুদ্ধে সে প্রণয বিস্মৃতিব অভিযোগ আনে

প্রথম পিবিতিব কালে
মনে নাই কি বল্যেছিলে,
ভুইলব না আব কনোকালে
ভুলিলে হে আজ,
তুমাব ভালবাসায় কাজ কি
ফিরে যাও হে দাগাবাজ।[৪]

প্রথম প্রেমেব আবেশ উন্মাদনা অবসিত। নায়িকাব প্রতি নায়কেব উপেক্ষায় নায়িকা-চিত্ত ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। অভিযোগেব মাধ্যমে তারই প্রকাশ। নায়িকাব উক্তিতে এমন এক ধবনেব রুক্ষতা আছে, যাতে তাব ধূলিমলিন রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আব একটি গানে তো নায়কেব প্রতাবণা নায়িকাকে পুরুষ বিদ্বেষিণী কবে তোলে। নায়িকাব মুখে ভর্ৎসনা, চোখে জল

প্রথম পিবতি কালে
আকাশেব চাঁদ হাতে দিলে
পিবিতি শিখায়ে এখন কাঁদালে
বড প্রাণে দাগা দিলে।
উঠায়ে তরুর ডালে
ছেদন কবিলে মূলে
বল বঁধু আগে কি বলেছিলে।
পুরুষ ভমরা জাতি

বড় রে কুটিলা মতি

অগম দরিয়ায় বঁধু ভাসালে।[৫]

প্রেমের সেই প্রথম দিনগুলিতে নায়ক-প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। নায়িকার স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। এ-গানের নায়িকা স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তাই ব্যথিত, সমগ্র পুরুষকুলের প্রতি তার বিরূপতা।

নিম্নোক্ত গানটিতে অভিযোগের তালিকা দীর্ঘতর। সে তালিকায় বাস্তব জগতের পরিচিত নারীটিরই যেন আবির্ভাব ঘটেছে :

বায়না ছিল ডুরিয়া শাড়ি

ফুল-কাটা জাকিট চুড়ি

কই দিলে হে মাথার জালি

পাউডার আর হিমানী—

মিছাই তুমার ফুটানী।

লাপতে নাই পাইটা ডাগর জানি তুমায় জানি।

শিশিরে কি চিড়া ভিজে

ফাঁকা কথায় মন কি মজে

চিনি তুমায় চিনি।[৬]

প্রতিশ্রুতি মতো ডুরে শাড়ি, ফুল-কাটা জ্যাকেট-চুড়ি, মাথার জাল, পাউডার, স্নো সবকিছুই অপ্রাপ্য থেকে গেছে। আস্ফালনসর্বস্ব নায়কের বিরুদ্ধে তাই নায়িকার বিদ্রূপ-বচন নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রাত্যহিকতার পরিধিতে নায়িকা বাস্তব মূর্তিতে দেখা দেয়। বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রেমিকার প্রেম এখানে স্বার্থতাড়িত। বাহ্য উপকরণের প্রতিই তার আকর্ষণ। নিতান্ত স্থূল তার চাহিদা। প্রেমিকের প্রতারণার বিরুদ্ধে তার কটু-তিক্ত অভিযোগ তাকে একান্তভাবেই রক্তমাংসের মানবী করে তুলেছে।

অন্যদিকে অসংখ্য ঝুমুরগানে নায়িকার আড়ালে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকাকেই যেন দেখতে পাই। বৈষ্ণবপদাবলীর অনুষঙ্গে তারা নানাভাবে ভিড় করে। পূর্বরাগ পর্যায়ের রাধার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই নিম্নোক্ত গানটিতে :

যমুনাকে জলকে যাতে শ্যাম দাঁড়ায় কদমতলে,

ও তার রূপ মনে করি, হেরিতে না পারি,

গুমরি গুমরি করি রোদন।

মনের আশা, কবে হবে গো মিলন ॥

যখন আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিতে নারি,

তারে না হেরি চলিতে না পারি

চলিতে চলিতে না চলে চরণ ॥

শাশুড়ি-ননদীর ঘরে কত জ্বালা দেয় অন্তরে,

আমি যে রমণী কি করি এখন,—

পিঁজরায় পুষা পাখী যেমন।[৭]

যমুনা, কদম্ববৃক্ষ, শাশুড়ি-ননদী ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি সুপরিচিত। শ্যামরূপ দর্শনের অতৃপ্তি,

অবরুদ্ধ কান্না, শ্যামের সঙ্গে মিলন প্রত্যাশা, সঙ্গিনীদের সান্নিধ্যজনিত সংকোচ বারবার আমাদের পদাবলীর রাধাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। খাঁচায় বন্দিনী পাখির মতো যার অবস্থা।

চণ্ডীদাসের কোনও কোনও পদ-পংক্তি এ সূত্রে স্মরণযোগ্য— (১) যমুনা সিনানে যাই/আঁখি মেলি নাহি চাই/তরুয়া কদম্বতলা পানে। (২) শাশুড়ি ননদী/যদি কথা কহে/গরল লাগে হিয়ায়। (৩) শাশুড়ি সদাই ডাকে/ননদী প্রহরী থাকে।... জ্ঞানদাসের 'দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি। ব্যাধমন্দিরে জনু শারী।।' পংক্তিদ্বয়ও মনে পড়ার মতো।

কোনও কোনও গানে রাধা বা কৃষ্ণের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। যেমন এই গানটিতে :

ঘরেতে না রহে মন আসে যায় অনুক্ষণ
কবে মিলন হবে গো তোমার সনে।[৮]

মিলন প্রত্যাশিনী শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরই যেন এখানে শোনা যাচ্ছে।

শ্যামের মোহনবাঁশির মোহবিস্তারী সুর নায়িকাকে ব্যাকুল করে তোলে, ঘটে রন্ধন-বিপর্যয় :

কালা কুলের গরব রাখলি নারে— হরে নিলি কুল—
করেতে মোহনবাঁশি কানেতে কদম্বফুল।
যখন যাই যমুনা জলে জলেতে দ্বিগুণ জ্বলে
উর্দ্ধপানে চাইলে পরে দেখবি কদম্বফুল।
যখন থাকি রাঁধাশালে কত চিন্তা হয় অন্তরে,
শ্যামের বাঁশি শুনলে পরে রান্নাতে হয় ভুল।[৯]

শেষোক্ত পংক্তিটি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বংশী খণ্ডের শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় : 'আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন'।। এমনতর রন্ধন-বিপর্যয়ের বিস্তৃত চিত্র পাই আর একটি গানে :

এখন, সই, রাইনতে গেলাম আপন মাথা খাইয়ে,
হেনকালে দিলেন শ্যাম মুরলী বাজিয়ে।
মুরলীর গান শুনে ঘরে রয় না প্রাণ।।
প্রথমকার ডাল রাইন্দে দিলাম বাসরে।
শাক দিয়ে শুক্তোনি অম্বলে দিলাম ঝাল,
শুধু হাঁড়ি চাল দিয়ে মেটাইলাম জ্বাল।
শেষে ব্যস্ত হয়ে ঢালিলাম জল।।
ভাজা ভাজা চালগুলি উঠিল সকল।
শিম মড়মড়, শিম মড়মড়, শিম দিয়েছি বেঁটে
কটু তেলে বেগুন ভেজে নামিয়েছি ঘেঁটে।।[১০]

এই গানটির সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বংশীখণ্ডের 'সুসর বাঁশির নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি' পদটির আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা যায় :

সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে শুনহ কাহিনী।

আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।

সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী ॥

রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি

শুনিআঁ বাঁশীর নাদে ॥

নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ

যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।

তা শুনিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ

ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥

সেইত বাঁশির নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি

চিত্ত মোর ভৈল আকুল।

হোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।

বিনি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল ॥

(বেশোআর = ঝাল বাটনা। সাকে = শাকে। কানাসোআঁ = রন্ধন পাত্রের কানায় কানায় পূর্ণ। জুতী = যুক্তি (রীতি)। রএ = রব করে। পাঞ্জরের = পিঞ্জরের। শুআ = শুক পাখি। পরলা = ধুধুঁলা। খেপিলোঁ = নিক্ষেপিলাম।)

অর্থ : 'সুস্বর বাঁশীর নাদ শুনিয়া যেমন রান্ধিলাম, বড়ায়ি (তাহার) কাহিনী শোন। অম্ল তরকারিতে ঝালবাঁটা দিলাম। শাক রাঁধিতে (রন্ধন পাত্রের) কাণায় কাণায় জল দিলাম। বড়ায়ি, বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া রন্ধনের যুক্তি (শৃঙ্খলা) হারাইলাম। নন্দের নন্দন আড়বাঁশী বাজাইতেছে, যেন পিঞ্জরের শুকপাখী গান করিতেছে। তাহা শুনিয়া আমি ঘৃতে পরলা (পরলা = ধুধুঁলা, ঝিঙার মত একজাতীয় তরকারী। পটোল নহে) বলিয়া কাঁচা সুপারি ভাজিলাম। সেই বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া বড়ায়ি চিত্ত আমার আকুল হইল। টাবা নেবু চিপিয়া (নিঙড়াইয়া) নিম ঝোলে দিলাম। বিনা জলে (হাঁড়িতে) চাউল চড়াইলাম।'[১১]

এই রন্ধন-বিপর্যয় নায়িকার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ততারই প্রমাণ দেয়।

কোনও কোনও ঝুমুরগানে মানিনী নায়িকার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। নায়িকা পদাবলীরই নায়িকা :

গত নিশি কোথা ছিলে কার মনস্কাম পুরাইলে

বঁধু হে এখন আইলে কিবা কাজে,

নিলাজ হে ফিরে যাও হে মানে মানে

ফিরে যাও হে কাল শশী যার কুঞ্জে পোহালে নিশি

ছি ছি বঁধু লাজ নাই বদনে, ফিরে যাও হে মানে মানে।[১২]

তুলনীয় : 'হেদেহে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস। বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস ॥' (চণ্ডীদাস)

বিরহিণী নায়িকার বিরহ-বেদনাতেও পদাবলীর নায়িকাকে মনে পড়ে :

কিবা করে গেছে ফিরে কাল আসিব বলে।

কাল নয়ন হৈল অন্ধ আশা পথ চেয়ে ॥

বাঁকা গেল কেমনে ছাড়িয়ে, শরমভরম হরে নিয়ে গো ॥

সমাজেতে হলাম দোষী যাহার লাগিয়ে।
বেঁধেছিলাম সহচরী পাষাণেতে হিয়ে।।
দ্বিজ গদাধরে বলে কি হবে ভাবিয়ে।
কাঁদাইতে ভালবাসা নিঠুর কালিয়ে।।[১৩]

শপথ মিথ্যা হয়। নায়ক দ্রুত ফিরে আসার কথা রাখে না। আশায় আশায় দিন যায়। গীত-রচয়িতা জানান, কালিয়া নিষ্ঠুর, তার ভালবাসা শুধু কাঁদাতে জানে। বিরহিণী নায়িকার আর্তি ও বিলাপে এ-গান পূর্ণ।

পদাবলীর নায়িকার সঙ্গে ঝুমুর গানের নায়িকার এই নিকট-সাদৃশ্যের কারণ হলো, বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক প্রচারের ফলে লৌকিক প্রেমের গানেও তার প্রভাব পড়েছে। অনতিক্রম্য সে প্রভাব। প্রেমের এমন কোনও দিক নেই, বৈষ্ণব পদাবলীতে যা অনুদ্ঘাটিত। সূক্ষ্ম কবিত্বের সঙ্গে প্রেমের বর্ণবিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যে বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার অনন্যতা অনস্বীকার্য। স্বভাবতই লৌকিক প্রেমের গানের নায়িকার ওপর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তার প্রভাব পড়েছে। লৌকিক নায়িকার অমার্জিত রূপটি এতে পরিবর্তিত হয়েছে। এতে ভালো হয়েছে, কী মন্দ হয়েছে— সে প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র।

---

১. মাহাত বিনয় : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ. ২৮৪।
২. ঐ।
৩. সাহা ধীরেন্দ্রনাথ : ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান, ১৯৭৩, পৃ. ১২৬।
৪. ঐ, পৃ. ১২৯।
৫. ঐ।
৬. ঐ, পৃ. ১৩১।
৭. মাহাত বিনয় : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ. ২৮৩।
৮. ঐ, পৃ. ২৮৫।
৯. ঐ, পৃ. ২৮৭।
১০. ভট্টাচার্য আশুতোষ : বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৬৬, পৃ. ৬১০।
১১. মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, ১৯৬১, পৃ. ৩২।
১২. মাহাত বিনয় : লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ. ২৯৪।
১৩. মাহাত বঙ্কিমচন্দ্র : ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ১৯৭৮, পৃ. ২৪৫।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় পত্রগুচ্ছের প্রয়োগ

১.

ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অভিনব। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র অন্তত তিনটি গীতিকায় পত্রগুচ্ছের প্রয়োগ ঘটেছে। গীতিকা তিনটি হলো : চন্দ্রাবতী, কমলা ও দেওয়ান ভাবনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-কে মধ্যযুগের সাহিত্য-

ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোনও শাখায় পত্রের ব্যবহার বিশেষ চোখে পড়ে না। সেদিক থেকে ঐ তিনটি গীতিকার স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য।

স্বভাবতই পত্র-সন্নিবেশের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, এগুলির সার্থকতা সম্বন্ধেও।

২.

'চন্দ্রাবতী' গীতিকায় মোট ছ'খানি পত্র রয়েছে। প্রথম পত্রটি জয়ানন্দের লেখা। চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে। চন্দ্রাবতীকে সে ভালোবাসে। কিন্তু চন্দ্রাবতীর কাছে তার ভালোবাসার কথা সংকোচহেতু নিজ-মুখে প্রকাশ করতে পারে না। সে তাই পত্রের সাহায্য নেয় :

কইতে গেলে মনের কথা কইতে না জুয়ায়।
সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায়।।...
মাও নাই বাপ নাই থাকি মামার বাড়ী।
তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পারি।।
যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন।।
তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই।
সর্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই।।...
তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর।
যোগল পদে হইয়া থাকবাম তোমার কিঙ্কর।।

পত্রটি আত্মনিবেদনমূলক। চন্দ্রাবতীর প্রতি জয়ানন্দের ভালোবাসার অকপট প্রকাশ পত্রের প্রতিটি ছত্রে লক্ষণীয়। জয়ানন্দের মনোভাব-প্রকাশে পত্রটি যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে পত্রটির প্রয়োজন স্বীকার করতেই হয়।

জয়ানন্দ আলোচ্য গীতিকার নায়ক। পত্রটি নায়ক-চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটক। বাল্যেই সে মাতা-পিতাহীন। স্নেহ-ভালোবাসার কাঙাল। তার সেই কাঙালপনাই পত্রটিতে অভিব্যক্ত। জয়ানন্দের এই স্বভাব-দুর্বলতাই তার পরিণতির হেতু। জয়ানন্দের আবেগপ্রবণতা ও স্পর্শকাতরতার পরিচয়ও পত্রটিতে লভ্য। পত্র-সহায়তায় স্বল্প পরিসরে জয়ানন্দ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। ঘন সংহত প্রকাশরীতিটি প্রশংসাযোগ্য। বলা বাহুল্য, পত্র-সন্নিবেশহেতুই তা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম পত্রের সূত্রেই দ্বিতীয় পত্রের অবতারণা। জয়ানন্দের পত্রের উত্তরে চন্দ্রাবতীর পত্র রচনা। চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের পত্রপাঠে খুশি হয়েছে। তার চোখে দেখা দিয়েছে আনন্দাশ্রু। চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে মনে মনে জয়ানন্দকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করেছে। পত্রের উত্তরে কিন্তু তার প্রকৃত মনোভাবটুকু সে জয়ানন্দের কাছে প্রকাশ করেনি। নারীর স্বভাবসুলভ লজ্জা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। চন্দ্রাবতী কুমারী কন্যা। পিতা দ্বিজ বংশীদাস নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। অসাধারণ তাঁর কুলমর্যাদা। চন্দ্রাবতী পিতৃ অনুগতা। পিতৃআজ্ঞা তার

কাছে শিরোধার্য। জয়ানন্দকে তাই সে পিতার শরণাপন্ন হতে বলে :

ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী॥

চন্দ্রাবতীর নির্দেশকে অবশ্যমান্য করেই জয়ানন্দের পক্ষ থেকে দ্বিজ বংশীদাসের গৃহে ঘটকের আবির্ভাব ঘটেছে। জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ের প্রস্তাবে দ্বিজ বংশীদাস সম্মতি জানিয়েছেন। চন্দ্রাবতীর পত্রটি এভাবেই ঘটনার অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। সেদিক থেকে পত্রটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চন্দ্রাবতী চরিত্রের পরিচয়ও পত্রটিতে লভ্য। সে লজ্জাশীলা, সমাজভীরু, পিতৃ অনুগতা ও সংযতমনা। স্বভাবে অন্তর্মুখী। জয়ানন্দের প্রতি তার প্রেম আন্তরিক। এ সমস্ত দিক থেকে আলোচ্য গীতিকার দ্বিতীয় পত্রটির প্রাসঙ্গিকতায় সন্দেহ থাকে না।

তৃতীয় পত্রটি জয়ানন্দের। সুন্দরী মুসলমান কন্যার উদ্দেশে এই পত্ররচনা। রূপমুগ্ধ জয়ানন্দ তার প্রতি পতঙ্গবৎ ধাবিত হয়। সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয় চন্দ্রাবতীকে। মুসলমান কন্যাকে প্রেম নিবেদন করে তার উদ্দেশে পত্র লেখে :

নিতি নিতি দেখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস।
প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ॥
পরকাশ কইরা কইতে নারি মনের কথা ধর।
তুমি কন্যা এই জগতে প্রাণের দোসর॥

পত্রের মাধ্যমেই মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পত্রটি তাই গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রসূত্রেই একসময় মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের বিয়ে হয়। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ঘটনার অগ্রগতিতে পত্রটির ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। জয়ানন্দ আবেগপ্রবণ, দুর্বলচিত্ত, অস্থিরমতি। পত্রটি তার পরিচয়বহ। মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের প্রণয়-সম্পর্কের বিস্তৃত কোনো বিবরণ আলোচ্য গীতিকায় অনুপস্থিত। একটি পত্রে শুধু প্রণয়-সূচনার ইঙ্গিতটুকু পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায়, এই একটি পত্র বহু বাক্‌বিস্তারের সম্ভাবনা হ্রাস করেছে। পত্র-প্রয়োগের এই কৌশলটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের দাম্পত্য-সম্পর্কের কোনও বিস্তৃত বিবরণও আলোচ্য গীতিকায় নেই। অবশ্য চন্দ্রাবতীকে লেখা জয়ানন্দের একটি পত্রে তার কিছুটা আভাস আছে। জয়ানন্দের এটি তৃতীয় পত্র, গীতিকার চতুর্থ পত্র। তুলনামূলকভাবে আয়তনে এ পত্রটি বেশ বড়ো।

চন্দ্রাবতীকে লেখা এ পত্রের ছত্রে ছত্রে জয়ানন্দের আক্ষেপ ও আর্তনাদ ধ্বনিত। মোহভঙ্গ ঘটেছে তার। মুসলমান কন্যার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের হয়নি। যন্ত্রণাদগ্ধ গ্লানিজর্জর জয়ানন্দ তাই অনুতপ্ত :

শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই॥

জয়ানন্দের প্রেমপিপাসা অচরিতার্থ। দুঃখ বেদনা আর হতাশায় তার অন্তর পরিপূর্ণ। জয়ানন্দের স্বীকারোক্তিতে পাই :

অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল॥...
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায়॥

অথচ এই চন্দ্রাবতীর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেই মুসলমান কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে। জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পারে। চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চায় :

একবার দেখিব তোমায় জন্মশেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গী বাঁকা॥...
শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের মালা।
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতালা॥

চন্দ্রাবতীর শৈশব-সহচর সে। একদা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা অত্যন্ত সত্য ছিল। সাময়িক ভুলবশত জয়ানন্দ সেই ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভালোবাসাকে আঘাত করেছে। কুপিত ভালোবাসা প্রতিশোধ নিয়েছে। জয়ানন্দের দাম্পত্যজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দহনজ্বালায় দগ্ধ জয়ানন্দ ক্ষণিকের জন্য চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎপ্রার্থী, ক্ষমা প্রার্থনাই তার উদ্দেশ্য :

জলে ডুবি বিষ খাই গলায় দেই দড়ি।
তিলেক দাড়াইয়া তোমার চান্দমুখ হেরি॥...
একবার দেখিয়া তোমায় ছাড়িব সংসার।
কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আমার॥

জয়ানন্দের এই অনুতাপপত্রটি তার ব্যর্থ দাম্পত্য-জীবনের কারণটুকুই যে শুধু আভাসিত করেছে তাই নয়, চন্দ্রাবতীর প্রতি তার গোপন ভালোবাসাটুকুও ইঙ্গিতগর্ভ হয়ে উঠেছে। পত্রটি জয়ানন্দের দাম্পত্য-জীবনের শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস যেমন বহন করে চলেছে, তেমনি চন্দ্রাবতীর প্রতি তার প্রকৃত মনোভাবটিও প্রকাশ করেছে। পত্রটি যে তাৎপর্যপূর্ণ তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

চন্দ্রাবতীর চিত্তে এ পত্রের প্রতিক্রিয়া সুতীব্র। তার অন্তর-আলোড়নের প্রাবল্য জয়ানন্দের প্রতি তার অব্যাহত ভালোবাসার প্রমাণ :

একবার দুইবার তিনবার করি।
পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্মরি॥
নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
একবার দুইবার পত্র যে পড়িল॥

চন্দ্রাবতীর হৃদয়াকাশে জয়ানন্দই প্রেমের ধ্রুবতারা। তার প্রেমের ভুবনে জয়ানন্দ এক ও অনন্য।

জয়ানন্দের পত্রপাঠে চন্দ্রাবতী তার সাক্ষাৎ অভিলাষিণী হয়। কাতর কণ্ঠে পিতার কাছে আবেদন জানায় :

শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা।
তুমি সে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর ব্যথা॥
জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে।
তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে॥

কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস আপত্তি প্রকাশ করেন :

শুনগো প্রাণের কন্যা আমার কথা ধর।
একমনে পূজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর॥
অন্য কথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে।
জীবন মরণ হইল যাহার কারণে॥

চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের উদ্দেশে যে পত্র লেখে তাতে যে জয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না :

পত্র লিখি চন্দ্রাবতী জয়ের গোচরে।
পুষ্পদূর্বা লইয়া কন্যা পশিল মন্দিরে॥

এ হলো আলোচ্য গীতিকার পঞ্চম পত্র। পত্রের বক্তব্য বিষয় অবশ্য অনুল্লিখিত। যদিও চন্দ্রাবতীর প্রতি দ্বিজ বংশীদাসের উক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে।

পত্রটির গুরুত্ব কিন্তু অসাধারণ। জয়ানন্দের আচরণ থেকে বোঝা যায়, চন্দ্রাবতীর প্রত্যাখ্যান তাকে আহত ও উন্মত্ত করেছে। আবেগপ্রবণ স্পর্শকাতর জয়ানন্দের আত্মহত্যার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। চন্দ্রাবতীর এ উপেক্ষা জয়ানন্দ সহ্য করতে পারেনি। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে সে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। চন্দ্রাবতী ধ্যান সমাহিত। জয়ানন্দের সমস্ত আহ্বান নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়। জয়ানন্দ হতাশ বিষণ্ণ। আত্মহত্যার সংকল্পে অবিচলিত। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ ঘটে না।

মন্দিরের রুদ্ধ দরজায় মালতী ফুল দিয়ে জয়ানন্দ তার বিদায়পত্র রচনা করে। চন্দ্রাবতীকে সম্বোধন করে জানায় :

শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥

চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে জয়ানন্দের এটি তৃতীয় পত্র। আলোচ্য গীতিকার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ পত্র। এ পত্রের প্রতিটি অক্ষর অশ্রুসিক্ত। অনুতাপদগ্ধ জয়ানন্দের আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ।

অনুতপ্ত জয়ানন্দের এই হাহাকার আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। শেষপর্যন্ত আমরা কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে উঠি। এখানেই জয়ানন্দের জয়। সে অপরাধী। তার অপরাধ সে অস্বীকার করে না। সেজন্যে সে অনুতাপও প্রকাশ করে। ক্ষমা চায়। তার বিবেক-তাড়না আমাদের কাছে গোপন থাকে না। পত্রটি তাই গুরুত্বপূর্ণ। জয়ানন্দের

মনোলোক এ পত্রে স্পষ্ট। তাকে আমরা কিছুতেই ঘৃণা করতে পারি না।

জয়ানন্দের আত্মহত্যার কারণটি এ পত্রে গোপন থাকে নি। আত্মগ্লানিই তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। প্রেমের অভাবই তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। জয়ানন্দ প্রেমিক। কিন্তু প্রেম তার জীবনে অলভ্য থেকে গেছে। 'চন্দ্রাবতী' গীতিকার অন্তিম পত্রটি আমাদের তাই বিহ্বল করে। বিষণ্ণও।

৩.

'কমলা' গীতিকায় ব্যবহৃত পত্রের সংখ্যা চার। প্রথম পত্রটি কারকুনের লেখা। কমলার উদ্দেশে। কমলা মানিক চাকলাদারের রূপবতী কন্যা। কারকুন মানিক চাকলাদারের কর্মচারী। কমলার রূপমুগ্ধ কারকুন চিকন গোয়ালিনীর মাধ্যমে কমলাকে প্রেমপত্র পাঠায়। প্রেমপত্রের ভাষা আবেগ-ব্যাকুল :

> কিরূপা কইরা কন্যা একবার চাও মোর পানে।
> পরাণে বাঁচাও মোরে ভরা যৌবন দানে।...
> তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা।
> তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতালা।।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে প্রেমপত্রটির ভূমিকা কম নয়। কমলা কারকুনের প্রণয়-প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে দূতী চিকন গোয়ালিনীর শাস্তিবিধান করেছে। ক্ষুব্ধ ও অপমানিত কারকুন প্রতিশোধ-কামনায় জমিদারের কাছে পত্র-মাধ্যমে কমলা-জনক মানিক চাকলাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জ্ঞাপন করেছে।

এই সূত্রেই আলোচ্য গীতিকায় দ্বিতীয় পত্রের অবতারণা। কারকুন জানায় :

> চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া।
> সাত ঘড়া মোহর কেবল গণিয়া বাছিয়া।।
> না জানায় এই কথা মালিক গোচরে।
> জমিদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে।।

কারকুনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। পত্রপ্রাপ্তিতে জমিদারের ঈর্ষা-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে :

> পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাম করিল।
> চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল।।

চাকলাদার বন্দী হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার পুত্রের দশাও হয়েছে অনুরূপ। কারকুন কৌশলে চাকলাদারী লাভ করেছে। কমলা তার জননীকে নিয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এসব কিছুই ঘটেছে জমিদারের কাছে কারকুনের পত্র পাঠানোর জন্যে। আলোচ্য গীতিকার কাহিনী-ধারায় দ্বিতীয় পত্রটির গুরুত্বে তাই সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় পত্রের মতো তৃতীয় পত্রটিও চক্রান্তমূলক। এ পত্রের লেখকও কারকুন। কমলার প্রবাসী মাতুলের উদ্দেশে এ পত্র লিখিত। কারকুনের লক্ষ্য কমলার প্রতি তার মাতুলকে বিরূপ করে তোলা। কমলা কারকুনের প্রণয়-প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় ক্রোধান্ধ কারকুন কমলার সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। পত্রে তাই কমলা সম্পর্কে মিথ্যা কলঙ্ক

রটনা করেছে। কমলার মাতুলকে লেখা পত্রে কারকুন জানিয়েছে :

শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী।
পরপুরুষে মইজে হইল কলঙ্কিনী॥...
কলঙ্কিনী হৈল তার গেল কুলজাতি।
এই পাপের নাহি জানা পরাচিত্তির পাতি॥
বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী।
তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শীঘ্র করি॥

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে কারকুনের খল স্বভাবের পরিচয় পাই। পত্র দুটিতে কারকুনের প্রকৃতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কারকুনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কমলার মাতুল কমলার প্রতি বিরূপ হয়েছে। প্রবাস থেকে স্ত্রীকে পত্র লিখে সমস্ত জানিয়ে অবিলম্বে কমলাকে গৃহ থেকে বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছে :

বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল।
ভাড়াই নাগর সঙ্গে ঘরের বাহির হইল॥
এমন কন্যারে তুমি ঘরে নাহি দিবে স্থান।
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইরা অপমান॥

আলোচ্য গীতিকার চতুর্থ পত্র এটি। কমলার মাতুল এ পত্রের রচয়িতা হলেও এর পেছনে কারকুনের প্ররোচনা সুস্পষ্ট। কারকুনের চক্রান্তই এতে কার্যকর হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থপত্রের মধ্যে সম্পর্ক যে সুদৃঢ় তাতে সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, কমলা মাতুলের পত্রটি পাঠ করে মাতুলের গৃহ ত্যাগ করেছে। এবং মৈষালের আশ্রয় নিয়েছে। কারকুনের চক্রান্তেই কমলার জীবন এভাবে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গীতিকার চারটি পত্রের প্রথমটি প্রেমপত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগপত্র। চতুর্থটি নির্দেশপত্র। সমস্ত পত্রের কেন্দ্রে রয়েছে কমলা, প্রকাশ্যে বা নেপথ্যে রয়েছে কারকুন।

'কমলা' গীতিকার আদি ও অন্তে কমলার অবস্থানের যে পার্থক্য তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই সমস্ত পত্র। কারকুনের প্রেমপত্র কারকুনের প্রতি কমলাকে বিমুখ করেছে। কারকুনের অভিযোগপত্র এবং কমলার মাতুলের নির্দেশপত্র কমলার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। আলোচ্য গীতিকার প্রথম পর্বে পাই কমলার দুর্ভোগ-চিত্র। ঐ দুর্ভোগের সঙ্গে পূর্বোক্ত চারটি পত্রের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। গীতিকার অন্তিমে পাই কমলার সৌভাগ্য-চিত্র। কমলার এই অবস্থা পরিবর্তনে কোনও কোনও পত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মসভায় কমলা স্বীয় জীবনের যে বৃত্তান্ত শুনিয়েছে তার সমর্থনে সে প্রমাণ হিসেবে কোনও কোনও পত্র উপস্থিত করেছে। যেমন, চিকন গোয়ালিনীর হাত দিয়ে পাঠানো কারকুনের প্রেমপত্র সম্পর্কে তার মন্তব্য :

না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে॥

কমলার জবানীতে আর একটি পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যে পত্রটি সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে অনবহিত ছিলাম। পত্রটি জমিদারের। মানিক চাকলাদার জমিদার-গৃহে বন্দী হলে জমিদার একটি পত্র পাঠিয়েছে। কমলা সে পত্র ধর্মসভায় তুলে ধরেছে :

এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
আমার বাপ হইল বন্দী কোন অপরাধে॥

কমলার বিরুদ্ধে মাতুলানিকে লেখা মাতুলের পত্রটিও কমলা নিদর্শন রূপে ধর্মসভায় দাখিল করেছে :

এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
ছাড়িলাম মামার বাড়ী মনের বিরাগে॥

এভাবে দেখা যাবে, অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের সঙ্গে তিনটি পত্রের সাহায্যও কমলা নিয়েছে। কমলার উক্তি এই সমস্ত পত্রের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। শেষপর্যন্ত কমলা যে তার পিতা ও অনুজকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং জমিদার-তনয়ের সঙ্গে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তাতে ঐ পত্রগুচ্ছের সহায়তা স্বীকার করতেই হয়। আর এ সমস্ত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে 'কমলা' গীতিকায় পত্রগুচ্ছ সন্নিবেশের যাথার্থ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

৪.

'দেওয়ান ভাবনা' গীতিকায় রয়েছে তিনটি পত্রের উদ্ধৃতি। এছাড়াও আর একটি পত্রের উল্লেখ আছে, উদাহরণ নেই। প্রথম পত্রটি মাধবের, সোনাইর উদ্দেশে লেখা। মাধব আলোচ্য গীতিকার নায়ক, জমিদার-তনয়। সুন্দরী সোনাইয়ের প্রণয়-মুগ্ধ সে :

তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা।
তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা॥

পত্রে সোনাইকে সে আত্ম-পরিচয় দিয়েছে, জানিয়েছে বিত্ত-সম্পদের কথা। সোনাইয়ের সামনে ভাবী সুখ-সমৃদ্ধির যে চিত্র সে রচনা করেছে তা যথেষ্ট প্রলোভনকর :

বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী।
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী॥...
বাহুতে পরাইয়া দিবাম বাজুবন্ধ তার।
হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার॥
বাপের বাড়ীতে আছে গো জলটুঙ্গীর ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর॥
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটুঙ্গীর বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা॥

প্রত্যুত্তরে নায়িকা সোনাই মাধবের উদ্দেশে জীবন-যৌবন সমর্পণ করেছে :

যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।

সেইদিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে ॥
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা ॥

এদিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সোনাইকে প্রাপ্তির জন্য সে সোনাইয়ের মাতুলকে প্রলুব্ধ করে। সোনাইয়ের মাতুল ভাটুক ঠাকুর সোনাইয়ের সঙ্গে দেওয়ান ভাবনার বিয়ের আয়োজন করে। সোনাই গোপনে দূতীর মাধ্যমে মাধবকে পত্র পাঠায়। আলোচ্য গীতিকার তৃতীয় পত্র এটি।

সোনাই জলের ঘাটে গেলে দেওয়ান ভাবনা তাকে অপহরণ করে নৌকায় তুলে নেয়। নদীপথে যাত্রাকালে মাধবের আবির্ভাব ঘটে। মাধব দেওয়ান ভাবনার কাছ থেকে সোনাইকে উদ্ধার করে। যথাসময়ে মাধবের সঙ্গে সোনাইয়ের বিয়ে হয়।

দেওয়ান ভাবনা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মাধবের পিতাকে বন্দী করে। মাধব পিতার উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। পিতা মুক্তি পায়, কিন্তু মাধব বন্দী হয়।

দেওয়ান ভাবনার কাছে উপস্থিত হয়ে সোনাই নিজের বিনিময়ে স্বামী মাধবের মুক্তি প্রার্থনা করে। দেওয়ান ভাবনা মাধবকে মুক্তি দেয়। সোনাই আত্মহত্যা করে। মাধবের প্রতি তার প্রেম অম্লান থাকে। প্রাণের বিনিময়ে সোনাই তার প্রেমের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে।

গীতিকার সূচনায় মাধবের প্রেমপত্রের উত্তরে সোনাই যে প্রেমপত্র প্রেরণ করে তার আন্তরিকতা ও যাথার্থ্য এভাবেই প্রমাণিত হয়। সোনাই যে নিছক মাধবের বিত্ত সম্পদের আকর্ষণে মাধবের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, মাধবের প্রতি তার প্রেম-ভালোবাসা যে নিখাদ, তার আত্মদানে তা প্রমাণ হয়। পরস্পরের উদ্দেশে প্রেরিত মাধব-সোনাইয়ের পত্র শেষপর্যন্ত তাই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৫.

উপরিউক্ত ত্রয়ী গীতিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, পত্র-প্রয়োগের এই রীতিটি সাহিত্যিক কৌশল হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। পত্রসমূহ কখনও ঘটনার অগ্রগতির সহায়ক, কখনও বা চরিত্র-উদঘাটক। পত্র-সন্নিবেশে পরিমিতি ও যাথার্থ্যবোধ রক্ষিত। এবং পত্রগুলি সাহিত্য গুণান্বিত।

পত্র-সন্নিবেশের এই রীতিটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোনও শাখায় বিশেষ দেখা যায় না। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধনপতি-আখ্যানে অবশ্য খুল্লনাকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে লহনা ও লীলাবতীর জাল পত্র রচনার প্রসঙ্গ আছে। কাহিনী-ধারায় সে পত্রের প্রভাবও অনস্বীকার্য। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে নায়ক সুন্দর হীরা মালিনীর মাধ্যমে নায়িকা বিদ্যাকে একটি স্বল্পায়তন প্রণয়লিপি পাঠিয়েছে। কাহিনীর অগ্রগতিতে প্রণয়লিপিটির ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এ-সবই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সেদিক থেকে 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা' ও 'দেওয়ান ভাবনা'-র প্রাচীনত্বে কি সংশয় জাগে না? মনে হয় না কি এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের রচনা?

বাংলার লোকনাট্যে প্রতিবাদপ্রবণতা

লোকনাট্যের মূল উদ্দেশ্য নাট্যরস পরিবেশন ও দর্শক মনোরঞ্জন। কিন্তু তাই সব নয়। লোকনাট্য লোকশিক্ষার এক বড়ো মাধ্যম। লোকসমাজ লোকনাট্য থেকে নানাভাবে শিক্ষা পেয়ে থাকে। জীবনচর্যার ধারাটি তাতে সমৃদ্ধ হয়। চলার পথটি আরও সুগম হয়। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলির মতো লোকনাট্যের ওপরেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সামাজিক প্রয়োজনেই লোকনাট্যের উদ্ভব। সমাজের মানুষজনকে আনন্দদান, গোষ্ঠী-চেতনার বিস্তার, সরাসরি গুরুমশায়গিরি না করেও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা, এসব যেমন লোকনাট্যের মাধ্যমে সাধিত হয়, তেমনি সামাজিক ন্যায়-নীতির আদর্শটিও লোকনাট্যে রক্ষিত হয়। লোকনাট্য তাই কখনও কখনও প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে ওঠে। অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, শোষণ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লোকনাট্য নেয় প্রতিবাদীর ভূমিকা। সমাজকে সচেতন করে। সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। এদিক থেকে লোকনাট্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আপাতদৃষ্টিতে সমাজের সাধারণ মানুষজনকে ভীরু ও দুর্বল মনে হতে পারে। কিন্তু তারা নির্বোধ নয়, সাংসারিক ও সামাজিক কাণ্ডজ্ঞানবর্জিতও নয়। ন্যায়-অন্যায় বোধ তাদের প্রবল। তারা প্রতিবাদমনস্ক। লোক-সাধারণের প্রতিবাদপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় ছড়ায়-প্রবাদে-ধাঁধায়-কথায় গীতি-গীতিকায় এবং লোকনাট্যে। অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিবাদপ্রবণতা লোকনাট্যের আসরকে ক্রিয়াচঞ্চল করে তোলে। লোকসংস্কৃতির জগতে লোকনাট্য বোধকরি সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম। লোকনাট্যের প্রভাবে লোকসমাজ যতখানি আলোড়িত ও সচেতন হয় ততখানি আর কোনও কিছুর দ্বারা হয় না। এজন্যে লোকনাট্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার দরকার আছে।

সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে লোকনাট্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রতিবাদপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ব্যতীত প্রতিবাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির ইতিহাসটি দ্বন্দ্বনির্ভর। সে দ্বন্দ্বের দুটি পক্ষ। যা আছে তাকে নিয়ে একটি পক্ষ। অপর পক্ষটি যা আছে তার পরিবর্তনকামী। প্রথম পক্ষ যদি হয় স্থিতিশীল, দ্বিতীয় পক্ষ তবে গতিবাদী। প্রথম পক্ষ যদি হয় রক্ষণশীল, দ্বিতীয় পক্ষ তবে প্রগতিশীল। একপক্ষ যদি হয় অত্যাচারপ্রবণ, অন্যপক্ষ তবে অত্যাচার-বিরোধী। এক পক্ষ যদি হয় শাসক, অন্য পক্ষ তবে শাসিত। এক পক্ষ ধনী হলে অন্য পক্ষ দরিদ্র। উভয় পক্ষে বিরোধ বাধে। কখনও প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরোধী। কখনও বা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা নেয়। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটায়। লোকনাট্যেও এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিচয় লভ্য। প্রতিবাদে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই বহিঃপ্রকাশ। যে সমাজ ও সংস্কৃতি যত বেশি প্রতিবাদমনস্ক, সে সমাজ ও সংস্কৃতি তত বেশি সচল জীবন্ত।

কৌতুক ও ব্যঙ্গ প্রতিবাদের প্রধান আশ্রয়। কৌতুকের অবলম্বন অসংগতি। সমাজের নানাবিধ অসংগতিকে ঘিরে কৌতুকের বিস্তার ঘটে। আর ব্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে আঘাত-আক্রমণ। লোকনাট্যের কৌতুক-ব্যঙ্গ খুব সূক্ষ্ম নয়। একটু মোটা দাগের। লোক-মানসের

সঙ্গে মানানসই।

প্রতিবাদের কারণ, প্রতিবাদের ধরনধারণ, প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝতে হলে, লোকমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী। প্রতিবাদের কারণ ক্ষোভ ও অসন্তোষ। প্রতিবাদের ধরনটি প্রত্যক্ষ। সোজাসুজি প্রতিবাদের প্রকাশ। কোনও কৌশলের বালাই নেই। নেই চাতুরী। প্রতিবাদী লোকসমাজ প্রায়শই পরিবর্তন-প্রয়াসী। প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচার শোষণ-পীড়নের বিরোধী। এই পরিবর্তন-কামনার মধ্যেই প্রতিবাদের তাৎপর্যটুকু খুঁজে নিতে হবে।

কিছু নমুনা পেশা করা যেতে পারে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বিরোধ-বৈষম্য প্রতিবাদের একটি উৎস। জলপাইগুড়ি জেলার 'ধামগান'-এর 'ভেস্তেশ্বরী' পালায় জনগণ ধনী জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সরকারী নিয়মে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির অতিরিক্ত জমি কারোর থাকলে সরকার তা খাস করে নেন। ঐ জমির ওপর জমির মালিকের আর কোনও অধিকার থাকে না। জমির মালিক হন সরকার। একে বলে 'ভেস্ট' করা। কিন্তু জমিদার-জোতদারের দল সরকারী আইনকে ফাঁকি দিয়ে অতিরিক্ত জমি বেনামী করে রাখে। গর্ভস্থ শিশু এমন কী গৃহপালিত জন্তুর নামেও জমির মালিকানা দেখানো হয়। ভূমিহীন মানুষেরা এতে ক্ষুব্ধ হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা সেই চোরাই জমি উদ্ধার করতে চায়। একদিকে জোতদার-জমিদারের দল, অন্যদিকে ভূমিহীন মানুষেরা। একদল অধিকার বজায় রাখতে চায়, অন্যদল তাতে বাধা দেয়। পারস্পরিক সংঘাতে লোকনাট্যের আসরটি দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকে আইন করে জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটে। এক শ্রেণীর জমিদার-জোতদার কিন্তু আইনকে ফাঁকি দিয়ে কারচুপি করে অতিরিক্ত জমি ধরে রাখতে চায়। 'ভেস্তেশ্বরী' পালাটি এই পটভূমিকায় রচিত। অন্যদিকে 'তাই লড়াই চলবে' পালায় আবার এ প্রতিবাদ লড়াইয়ে পর্যবসিত:

> এ লড়াই চলবে,
> লড়াই চলছে আবার চলবে।
> রে-ভাই গরীব-ধনীতে লড়াই চিরস্থায়ী।

প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত এ পালায় শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয়।[১] প্রতিবাদ এখানে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের।

একটি আলকাপ গীতে নারীলোলুপ ধনী মহাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় কোনও এক পল্লীবধূ ধনী মহাজনের কাছে দুটি টাকা ধার চাইলে, মহাজন তার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। মহাজনের আচরণে পল্লীবধূ ক্ষুব্ধ হয়, টাকা নিতে অস্বীকার করে, প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ। গীতিটি উদ্ধারযোগ্য :

পল্লীবধূ — শুন ওহে মহাজন
বাঁচেনা আর ছেলের জীবন
দুটি টাকা ধার দিবেন আমারে।

মহাজন — আরে বল বল ও সুন্দরী
কত লিবে ধান

আমার ত এ হ'ল কারবার।
যত লিবে লেওনা,
ফেরত তো লিব না
আমি থাকতে অভাব কি তোমার।
আমার ত এ হ'ল কারবার।।

পল্লীবধূ — কি কথা বলিস মহাজন,
কেমন তোমার রীতি
এবার মুখ সামলিয়ে কথা বল
নইকো অসতী হে।
ঝকমারী তোর টাকাকড়ি।
ঘুরে ফিরে চললাম বাড়ী।।
তোর টাকা লিবে কেটা।
তোর মুখে মারি ঝাঁটা।।
ও তোর ধন দৌলত সব উড়ুক।
আগুন লাগ্যা পুড়ুক
আর ভগবান বিচার করুক।।[৩]

প্রতিবাদ এখানে শ্লেষতীক্ষ্ম। পল্লীবধূর প্রতিবাদে অভিশাপের অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত। সতীত্বের তেজ ও দীপ্তিতে সে প্রতিবাদ ভাস্বর। মহাজন সুযোগসন্ধানী। রূপোর বিনিময়ে রূপের প্রত্যাশী। পল্লীবধূ তার অপচেষ্টা প্রতিহত করে। বিত্তবানের নারী লোলুপতা বাধা প্রাপ্ত হয়। দুর্বল চরিত্র-তেজে কিন্তু প্রবলকে পরাভূত করে। একদিকে প্রবল, আর একদিকে দুর্বল, শেষপর্যন্ত দুর্বলই জয়ী হয়। লোকমনস্তত্ত্বকে মান্য করেই। লোকসমাজ দুর্বলের পক্ষে। পল্লীবধূকে উপলক্ষ করে বস্তুতপক্ষে লোকসমাজের প্রতিবাদস্পৃহাই চরিতার্থ হয়। এখানেই লোকমনস্তত্ত্বের আধিপত্য।

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে বহুকালাগত এক অভিশাপ। সমাজ-দেহে এ প্রথা দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। লোকসমাজ এ প্রথার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যে সচেতন তার প্রমাণ ছড়া গীতি কিংবা প্রবাদে লভ্য। লোকনাট্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রথাটির বিরুদ্ধে লোকসমাজের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রতিবাদে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বোলান গানের রঙপাঁচালিতে কন্যার অসহায় পিতার আক্ষেপোক্তিতে তারই পরিচয়:

আমি অত গয়না কোথায় পাব?
মাটির নয় যে গড়িয়ে দেব।[৪]

পাত্রপক্ষের দাবি পূরণের সামর্থ্য নেই কন্যার পিতার। ব্যঙ্গমিশ্রিত প্রতিবাদ তাই তাঁর কণ্ঠে।

পিতা প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে না পারায় কন্যা স্বামীগৃহে নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়। আমাদের সমাজ-সংসারে এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। একটি আলকাপ পালায় দেখা যায় যৌতুকলোভী স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে পুনরায় বিয়ে করেছে। স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর চোখ দুটি তাই অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠে হাহাকার। পিতামাতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অভিমানের প্রকাশ ঘটে :

মাগে, ক্যান্যা প্যাটে ধৈর‍্যা
ছিলিগে মা ওগে মাগে
মাগে, ক্যান্যা মানুষ কৈর‍্যা
ছিলিগে মা ওগে মাগে
মাগে, ক্যান্যা সহাগ কৈর‍্যা
ছিলিগে মা ওগে মাগে
মাগে, তোর বুকের দুধের এতো
জ্বালাগে মা ওগে মাগে
মাগে, আর যে সহিতে পারিন্যা
গে মা ওগে মাগে
বাপুজি, টুটি চিপ্যা
মারনি ক্যান্যা
ওজি বাপুজি
বাপুজি, বড় ক্যান্যা
কৈরল্যা বাপুজি
ওজি বাপুজি
বাপুজি, বিহা ক্যান্যা
দিল্যা বাপুজি
ওজি বাপুজি
বাপুজি, আর যে সহা
যায়না বাপুজি
ওজি বাপুজি।"

মাগো, কেন পেটে ধরেছিলে? মাগো, কেন মানুষ করেছিলে? মাগো, কেন সোহাগ করেছিলে? মাগো, তোর বুকের দুধের এত জ্বালা! মাগো, আর যে সইতে পারি না। বাপুজি, গলা টিপে মারোনি কেন? বাপুজি, বড়ো কেন করলে? বাপুজি, বিয়ে কেন দিলে? বাপুজি, আর যে সহ্য হয় না।

হৃদয়ভেদী এই যে কান্না, এ কান্নায় তো প্রতিবাদেরই বহিঃপ্রকাশ। পিতা-মাতাকে সম্বোধন করে সমাজ-প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানায় কন্যা। সর্বনাশা প্রথার বীভৎসতাটুকু প্রকট হয়ে ওঠে। আমাদের বিদ্রোহী করে তোলে। আর সেখানেই এ গীতির সার্থকতা।

অসহায় কন্যার করুণ ঐ আর্তনাদ নিঃসন্দেহে আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে। পাশাপাশি স্মরণ করা যেতে পারে লোকনাট্য গম্ভীরার একটি খণ্ডাংশ। পিতা ও কন্যার কথোপকথনসূত্রে সেখানে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার বর্ষিত। ব্যঙ্গের কশাঘাতে এ প্রথার পৃষ্ঠপোষক ও প্রশ্রয়দাতাদের জর্জরিত করা হয়েছে —

পিতা। মা তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি খায়ে
অমন শিক্ষাতে ধিক, অঙ্ক অধিক বেচে যেন শালিক টিয়ে।

কন্যা। সোনার চেন, সোনার ঘড়ি, গর্ব যাদের গলায় পরি,

অমন পণ্ড কিনো না বাবা দিয়ে টাকাকড়ি।
বিদ্যা কি পদার্থ, অপদার্থ বুঝে না ছেলে পেয়ে।

পিতা। ভন্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই রক্ত চোষে
বি-এ এল-এ হলে ছেলে অর্থ পিয়াসী
ধিক্ উচ্চশিক্ষা, স্বদেশী দীক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে।

কন্যা। বেচবে কেন ভিটেমাটি, বেচবে কেন ঘটিবাটি,
মজবে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর কাটি।
ভাল কুলীন কুল ই, কশাইগুলি, ফিরছে ছুরি শানাইয়ে।'

বিয়ের প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হয়ে যারা যৌতুকের দাবিকেই প্রাধান্য দেয়, তাদের আর যাই হোক যথার্থ মানুষ বলা চলে না। শিক্ষা মানুষকে উদার করে। কিন্তু আমাদের সমাজে যে যত বেশি শিক্ষিত, তার যৌতুকের দাবির বহরটি সম্ভবত তত লম্বা। ব্যতিক্রম কিছু আছে বৈকি, কিন্তু তার সংখ্যাটা আঙুলে গোনা যায়। দুটি নরনারীর পবিত্র পরিণয় সম্পর্ক, দেনা-পাওনার হিসাবনিকাশে যে ব্যাহত হয় তা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, পাত্রপক্ষের লোলুপতা ও হৃদয়হীনতা কন্যাপক্ষকে পদে পদে বিড়ম্বিত করে। কন্যার পিতাকে এজন্য অনেক সময় সর্বস্বান্ত হতে হয়। উপরিউক্ত কথোপকথনে কন্যার জবানীতে পাত্রের পিতাকে তাই কশাইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অপর একটি গম্ভীরা গীতিতে স্বল্প পরিসরে কন্যার পিতা ও পাত্রের পিতার অবস্থা-বৈপরীত্য প্রদর্শনে এ প্রথার বিরোধিতা করা হয়েছে —

(দেখো) কনের বাপের ঘাড়ে ঝুলি
বরের বাপের লম্বা বুলি।

একদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভিক্ষুকের অবস্থা। অন্যদিকে পাত্রের পিতা বাক্যবাগীশ। দেবতা শিবের কাছে তাই প্রার্থনা — 'পণ প্রথাটা উঠিয়ে দিয়া সমাজ রক্ষা কর'।' বিপরীতধর্মী চরিত্র-সন্নিবেশ লোকসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। ভালো-মন্দ, বুদ্ধিমান-বোকা, সবল-দুর্বল এসব চরিত্রকে পাশাপাশি দেখতে আমরা অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে কন্যার পিতা এবং পাত্রের পিতাকে একত্র উপস্থিত করে কন্যার পিতার প্রতি যেমন আমাদের সহানুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি পাত্রের পিতার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিবাদী মানসিকতা থেকেই ঐ বিরূপতার উদ্ভব। কন্যার পিতার ঐ অবস্থা যে পাত্রের পিতার জন্যই তাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। পাত্রের পিতার সীমাহীন লোভই পাত্রীর পিতার অবস্থা-বিপর্যয়ের হেতু। পাত্রের পিতা তাই ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

সমাজ জীবনের নানানতর অসংগতি প্রতিবাদের বিষয় হয়েছে। যেমন —

বাবা থাকে টেনা পরে,
মা খেতে পায় না,
তার বেটারা করছে এখন
টেরিকোটের বায়না।'

পিতার পরনে মলিন জীর্ণ বস্ত্র, মাতার অন্নাভাবে দিন কাটে, অথচ ছেলেরা টেরিকটের পোষাক পরতে চায়। পিতামাতার দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের স্পর্শ করেনা। নিজেদের সখ-সৌখীনতা পূরণেই ব্যস্ত। কর্তব্যবিমুখ স্বার্থপর ছেলেদের আচরণের তাই

সমালোচনা করা হয়। সে সমালোচনায় থাকে ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

আর্থিক সামর্থ্য থাক বা না থাক পোষাক বিলাসিতায় যুব সমাজের ঘাটতি নেই। সাদামাটা পোষাকে আজকাল আর মন ওঠে না। যুবসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতা প্রতিবাদের বিষয় হয়ে ওঠে। গম্ভীরার একটি ডুয়েটে সম্পাদক-সম্পাদিকার বাদ-প্রতিবাদে পোষাক-ব্যাপারে আতিশয্য ও আড়ম্বরপ্রিয়তার বিরুদ্ধে তাই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় —

সম্পাদক—তোমাদের জোগাতে ফ্যাসান, পুরুষ হালাকান পয়সা কোথায় পায়?
রকমারি ব্লাউজ সাড়ী কত কিনতে পারা যায়?
সম্পাদিকা—মোদের ফ্যাসান কিবা আর
নিজের দিকে তাকাও একবার
যার ঘরে চড়ে না হাঁড়ি, তার সুটের কি বাহার!
বাবুয়ানি তার শোভে কি যার ঘরে শুয়া চাঁদ দেখা যায়!*

ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, চালে খড় জোটে না, অথচ পরনে বাহারী সুট। প্রদর্শনধর্মী এই যে আড়ম্বর, লোকনাট্য এর বিরোধিতা করেছে। বাহ্য চাকচিক্যে অনাস্থা প্রকাশ করেছে।

সমাজের বহুবিধ সমস্যাও প্রতিবাদের অবলম্বন হয়েছে। যেমন, বেকারত্ব। একটি গম্ভীরা গানে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে :

বি. এ পাশ করার নেই কোন দাম,
চাকুরী খুঁজ্যা হনু হালাকান।
(আবার) রুপিয়া দিলে চাকরী মিলে
নইলে ব্যাকিং ধাক্কা চাই।*

বি. এ পাশ করেও চাকরি পাওয়া যায় না, চাকরি খুঁজে খুঁজে পরিশ্রান্ত (হালাকান) হতে হয়। ঘুষ দিলে অথবা মুরুব্বির থাকলে অবশ্য চাকরি পাওয়া যায়। বেকার যুবসম্প্রদায়ের চিত্তজ্বালারই বহিঃপ্রকাশ এ গানে।

১৯৪৬-এর একটি গম্ভীরা গানে পাই অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অনাচার-প্রসঙ্গ। দেবতা শিবকে সম্বোধন করে গানটিতে বলা হয় :

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে, ওহে পশুপতি,
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওনা মোদের কি দুর্গতি।
জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুড়্যা
ব্লাক মার্কেটি বাজার ভইরা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায় জ্বালায় বিজলী বাতি।*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) তখন সবে শেষ হয়েছে, তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। কালোবাজারীদের রমরমা, সাধারণ মানুষজন উদ্ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবন, দুর্গতির সীমা নেই। গানটি সেই পটভূমিকায় রচিত। একদিকে অসৎ ব্যবসায়ীদের বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্য, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অশেষ দুর্গতি। এই বৈপরীত্য থেকেই ক্ষোভ ও অসন্তোষের উদ্ভব। অসহায় সাধারণ মানুষের দল তাই দেবতা শিবের কাছে মনোবেদনা ব্যক্ত করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ গোপন থাকে না।

অভিযোগের আর একটি নমুনা :

শিব হে
বড় দুঃখে পড়ে, বলি তোরে
শুনেক দিয়া কান
বল পশুপতি, এ দুর্গতির
নাই কি অবসান।।

....

ট্যাক্সের উপর, ট্যাক্স গিয়ে বেড়ে
জিনিষপত্রের দরও গেছে চড়ে
যাদের দিনরাত খেটে, জুটেনা পেটে
হয় হুতাসে যাবে জান।।[১১]

গানটিতে ট্যাক্সের নামোল্লেখ নেই, কী হারে ট্যাক্সের বৃদ্ধি ঘটেছে তারও কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু ট্যাক্সের বোঝা যে দুর্বহ হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়। করভারপীড়িত জনগণ তাই প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রতিকারের প্রত্যাশায় দেবতা শিবের শরণাপন্ন হয়েছে। দেবতা শিবকে উপলক্ষ করে ক্ষোভ ও অসন্তোষটুকু ব্যক্ত করেছে। শিব এখানে শাসককুলের প্রতিনিধি।

দেশের উন্নতি শিক্ষার বিস্তারের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সফল হতে পারিনি। শিক্ষার মান নীচু হয়েছে, শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়নি। শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল, ততখানি গুরুত্ব কিন্তু দেওয়া হয় নি। লোকনাট্য গম্ভীরায় তাই শিক্ষা-সমস্যার কথা উঠেছে। শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার সমালোচনা করা হয়েছে। শিবকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে — 'হামাদের এই ভারতে ত্রিশ ভাগ লোক শিক্ষিত আর সত্তর ভাগ লোক অশিক্ষিত। তাও ত্রিশ ভাগ লোকের মধ্যে সহি করতে কলম ভাঙ্গা দিবে। এই যে শিক্ষায় অবনতি — এদিকে নজর দাও।'[১২] এও তো প্রতিবাদ।

ধর্ম নিয়ে বিভেদ-বিদ্বেষ হানাহানি সংঘাত — এসবের বিরুদ্ধে লোকনাট্য। বাংলার লোকসমাজ সাধারণভাবে ধর্মসহিষ্ণু। শতাব্দী পরম্পরায় বহু সংখ্যক সাধু-সন্ত-পীর-ফকির-সাঁই-দরবেশের আবির্ভাবের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করেছে কিছু সংখ্যক ধান্ধাবাজ রাজনৈতিক নেতা এবং কপট ধর্মগুরু। তারাই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয়দাতা। লোকনাট্য গম্ভীরায় এই ভেদবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বিভেদকামীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করা হয়েছে :

কুঠে আল্লা ভগবান, কুঠে আছে আদ্যের থান,
মন্দিরে কি মসজিদেতে পূজা সিন্নি খান,
তোমার নূরেতে কি টিকিতে ব্যোসা তসবীর কি মালা
ঘুরায়।।[১৩]

কোথায় আছেন আল্লা? কোথায় ভগবান? কোথায় আছে আদ্যের (আদি দেবতার) স্থান? ভগবান কি মন্দিরে পুজো নেন? আল্লা কি মসজিদে সিন্নি খান? মুসলমানের নূর আর হিন্দুর টিকি তো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন। তার সঙ্গে আল্লা বা ভগবানের কী সম্পর্ক

তাঁদের সংকীর্ণ সীমায় বাঁধা যায় না। ধর্মবুদ্ধি এখানে মোহ বা মিথ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। বরং প্রতিবাদে শাণিত।

সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু জনগণের স্বপ্ন সফল হয় নি। শোষণ-পীড়ন অত্যাচার-অবিচার অব্যাহত। শান্তি বিপন্ন। দেশ জুড়ে নানা বিশৃঙ্খলা। হিংসা বিদ্বেষ আর হানাহানি। গণতন্ত্রের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত। জনগণের প্রত্যাশা অপূর্ণ। স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রে তাই তাদের আস্থা নেই। পরিবর্তে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ ও জ্বালা। গম্ভীরা গানে যার বহিঃপ্রকাশ :

ছিনু পরাধীন, সুখে গেছে দিন
এখন স্বাধীনতার ফল বিষময়।।
গণতন্ত্রের আসল রূপটা, বেশ উঠেছে ফুটে
মারামারি কাটাকাটি, নারীর ধরম লুটে হে
ঘুষ, ঘেরাও, গুন্ডাবাজী, হরতাল, ইলেকট্রিক, পুলিশ লাঠি
গ্যাস গুলি আর বোমা, এসব রাম রাজত্বের গয়না
দেশে ধ্বংসলীলা চলছে খোলা পথে লাগছে ভয়।[১৪]

নেতারা লোভী, স্বার্থপর, কপট ও মিথ্যাবাদী। তাদের আচরণ যুগপৎ লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর :

ব্যস্ত সবাই গদির লাগি, কাজের বেলায় মান্দা ......
গরু মেরে জুতো করে দান, গদিওয়ালারা এমনি শয়তান।
ওরা মুখে যেটা বলে, কাজে উল্টা ঠিক তার চলে
তাই আজ হিংসার আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ
ছড়িয়ে দেশময়।[১৫]

গদিবিলাসী নেতাদের প্রতি জনগণের মনে রয়েছে অপরিসীম ঘৃণা। গানটিতে নেতাদের প্রতি জনগণের ধিক্কারই প্রকাশিত।

প্রশাসনের বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই। প্রতিবাদী মনোভাব এক্ষেত্রেও দেখা যায়। মালদহ শহরকে আশ্রয় করে গম্ভীরা গানে প্রশাসনিক যে সমস্ত দোষ ও দুর্বলতার উল্লেখ করা হয়েছে তা এদেশের যে-কোনও শহরের প্রশাসন সম্পর্কেই সত্য। মালদহ শহর তো উপলক্ষ মাত্র। যেমন —

(১) যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে রাস্তা চলা দায়।
(২) জেলার সদর হাসপাতাল, হয়ে আছে মহাকাল।
রুগীরা হয় নাকাল, ঔষধ চিনে মারা যায়।।
(৩) সরকারী এলেকট্রিক সাপ্লাই, গুণের তাদের অন্ত নাই।
জ্যোৎস্না রাতে আলো জ্বালায়, আঁধারে নিভায়।
চুরি করে গুন্ডা চোর, আলোর দয়া এদের উপর।
সাথে পুলিশ যোগ দিয়ে, চুরি সে করায়।।
(৪) পোস্ট অফিস সৌখীন হয়ে থাকে উদাসীন।
বাড়ীর পাশে একমাসে চিঠি পাওয়া যায়।

রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পুলিশ, ডাকবিভাগ সর্বত্র বিপর্যস্ত অবস্থা। প্রতিবাদ না করে উপায় কী? বিদ্রূপের কশাঘাতে প্রতিবাদ তীক্ষ্ণতা পায়।

বাংলার লোকনাট্য দর্শক মনোরঞ্জনের দায়িত্ব নিশ্চয় পালন করেছে। কিন্তু তার ভূমিকা সেখানেই শেষ হয়ে যায় নি। বাংলার লোকনাট্য প্রতিবাদের হাতিয়ারও হয়ে উঠেছে। জনগণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ ও ঘৃণাকে প্রকাশ করেছে। কখনও কৌতুকে, কখনও ব্যঙ্গে, অন্যায়-অবিচার অত্যাচার-উৎপীড়ন অসংগতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। প্রতিবাদপ্রবণতা লোকনাট্যের উপভোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিনয়ের আসরকে করেছে সরগরম। বাঙালি দর্শক শুধু তৃপ্তই হয় নি, উদ্দীপ্তও হয়েছে। প্রতিবাদপ্রবণতা বাংলার লোকনাট্যকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

১. ভৌমিক শিবপদ, লোকনাট্য : ধামগান, লোকশ্রুতি, ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ১২৫-১২৬, পৃ. ১২৮।
২. ঘোষ দিলীপ, বাংলার লোকনাট্য : আলকাপ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৫-৪৬।
৩. চক্রবর্তী সুধীর, লোকনাট্য বোলান, লোকশ্রুতি, ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৭৭।
৪. ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ গান, ১৯৯৫, পৃ. ১১৮।
৫. ঘোষ প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, ১৯৮২, পৃ. ৭৩।
৬. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃ. ২৫১।
৭. চক্রবর্তী সুধীর, লোকনাট্য বোলান, লোকশ্রুতি, ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০, পৃ ৭৮।
৮. ঘোষ প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, ১৯৮২, পৃ. ১১১।
৯. ঘোষ প্রদ্যোত, গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব : একাল ও সেকাল, ১৩৭৫, পৃ. ৬০।
১০. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃ. ২৪৯-২৫০।
১১. মালদহ জেলা থেকে অধ্যাপক পুষ্পজিৎ রায় কর্তৃক সংগৃহীত।
১২. ঐ।
১৩. ঘোষ প্রদ্যোত, গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব : একাল ও সেকাল, ১৩৭৫, পৃ. ৪৬।
১৪. ঘোষ প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি : গম্ভীরা, ১৯৮২, পৃ. ১১০।
১৫. ঐ।

বাংলার লোকসাহিত্যে নির্যাতিতা বধূ

আমাদের সমাজজীবনে বধূ নির্যাতন কোনও নতুন ব্যাপার নয়। বেদনাদায়ক হলেও এ-কথা সত্য। বধূ-নির্যাতন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপারে পর্যবসিত। যেন জীবন-যাপনেরই এক অঙ্গ। অন্ন-পানীয় গ্রহণের মতোই সহজ সরল ব্যাপার আর কী।

নির্যাতনের রকমভেদ আছে। দৈহিক নির্যাতনের মতো মানসিক নির্যাতনও তো নির্যাতন। বাংলার বধূসমাজ দ্বিবিধ নির্যাতনেরই শিকার। নির্যাতনে আছে মাত্রাভেদ। নির্যাতনে তাই কখনও লঙ্কার ঝাঁজ, কখনও বা খড়্গের ধার।

লোকসাহিত্য লোকসমাজের দর্পণ। বাংলার লোকসাহিত্যে বধূ-নির্যাতনের প্রসঙ্গটিও নানাভাবে উপস্থাপিত। বাঙালি-সংসারে বধূ-নির্যাতনে যিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণকারিণী, তিনি হলেন শাশুড়ি ঠাকুরানী। ছেলেভুলানো ছড়ায় কন্যার শাশুড়িকে ভোলানোর জন্যে কন্যার জননী উড়কি ধানের মুড়কির সাহায্য নেন— 'উড়কি ধানের মুড়কি দেবো শাশুড়ি ভোলাতে।' একি নিতান্তই কৌতুক? না বোধহয়। এখানে যে মনস্তত্ত্ব সক্রিয় তা হলো শাশুড়িকে ভোলানো কঠিন। অথচ কন্যার মঙ্গলের জন্যে শাশুড়িকে বশীভূত করতে হবে। শাশুড়ি যাতে বিরূপ না হন সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, বিরূপতার পরবর্তী ধাপ হল নির্যাতন। এখানে নির্যাতনের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু একটা সম্ভাবনা যেন উঁকি দেয়। একটি খেলার ছড়ায় পানকৌড়িকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠোসে।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোটোসে।।

পানকৌড়ি তো উপলক্ষ। শাশুড়ি-ভীতিই এখানে মুখ্য। শাশুড়ির আদেশ যে অলঙ্ঘনীয় তা বেশ বোঝা যায়। কর্তব্যে গাফিলতির জন্যে নির্যাতনের আশঙ্কাও রয়েছে বৈকি। শাশুড়ির গুরুত্বটুকু অনস্বীকার্য।

অন্য একটি ছড়ায় অবশ্য লাঞ্ছিতা বধূ শাশুড়ির সহানুভূতি প্রত্যাশিনী :

রাগ করো না শাশুড়ি গো, আমি তোমার মেয়ে।
তুমি যদি তাড়াও তবে দাঁড়াই কোথা যেয়ে।।

ছড়ায় যার আভাস মাত্র, প্রবাদে তাই প্রকাশ্য। প্রবাদে বারংবার নির্যাতিতা বধূর অশ্রুসজল চোখ আর ম্লান বিষণ্ণ মুখের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। প্রবাদে শাশুড়ি-বধূর সম্পর্কটি কটু তিক্ত। বধূর রূপ-গুণের সমালোচনায় একদিকে যেমন শাশুড়িসমাজ সহস্রমুখ, অন্যদিকে তেমনি বধূদের কাছে শাশুড়ি গুরুজন হলেও দুর্জন, দূর-জনও। শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক তাই আদা-কাঁচকলার সম্পর্ক, তেলে-বেগুনের সম্পর্ক। উভয়ে একই পরিবারের সদস্যা, অথচ মানসিকতায় প্রায়শই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। শতাব্দী-পরম্পরায় প্রবাদ এই ব্যবধানের সাক্ষী। আর এর মূলে আছে শাশুড়ির বধূ-নির্যাতন। একজন নির্যাতনকারিণী, অন্যজন নির্যাতিতা।

বাংলার প্রবাদ সাহিত্যে শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক এক জটিল বিচিত্র মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বধূ সম্পর্কে শাশুড়ির মনোভাব অবজ্ঞাপূর্ণ। শাশুড়ির চোখে বধূর সবকিছুই নিন্দনীয়। প্রতিবেশিনীরা বধূর রূপের যতই প্রশংসা করুক না কেন, শাশুড়ির চোখে সে রূপ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর :

কোন কালে বউ রূপসী
জাড়কালে বউয়ের জাড়কাঁটা,
গরমকালে ঘামাচি।।

শাশুড়ি বধূকে রূপবতী বলে মনে করেন না। বধূর যে রূপটি শাশুড়ির চোখে পড়ে তাতে তিনি দেখেন, জাড়কালে অর্থাৎ শীতকালে বধূর দেহ কাঁটার মতো চর্মরোগে আচ্ছন্ন, আর গ্রীষ্মকালে বধূর দেহের শ্রী-সৌন্দর্য ঘামাচিতে লুপ্ত। শাশুড়ি তাই বধূর রূপ নিয়ে ব্যঙ্গ করেন। বধূর রূপকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ তিনি। আসলে এ হলো

সদ্যযৌবনার প্রতি বিগত যৌবনার ঈর্ষা। শাশুড়ি বধূর রূপের শত্রু। বধূর রূপের নির্মম সমালোচক। রূপসী বধূ তাই উপহাসের পাত্রী, অবজ্ঞার পাত্রী।

কন্যার সঙ্গে তুলনায় বধূর রূপদৈন্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি :

পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।

উনুনমুখী বউ এসে বাটায় পান খায়॥

ব্যঙ্গবাণে বধূকে বিদ্ধ করেন শাশুড়ি। একদিকে কন্যা-প্রীতিতে তিনি অন্ধ, অন্যদিকে বধূর প্রতি বিরূপতা। কন্যার শূন্যস্থানে বধূকে অভিষিক্ত করতে পারেন না তিনি। ঔদার্যের বড়ই অভাব। অথচ এই ঔদার্য তো তাঁর কাছে একান্তই কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু না, এ ঔদার্য তিনি দেখাতে চান না। আধিপত্যপ্রবণা তিনি। তাঁর আধিপত্যটুকু বজায় রাখতে চান। শাশুড়ির আশঙ্কা, বধূর আবির্ভাবে কর্ত্রীত্বের বদল হতে পারে। শাশুড়ি আপন কর্ত্রীত্বটুকু বজায় রাখার জন্যে সদা সচেষ্ট। তাঁর নিজের হাতে গড়ে তোলা সংসারে আর একজন নারীর আধিপত্য বিস্তারের বিরোধিনী তিনি। বধূকে তাই শাশুড়ি সহ্য করতে পারেন না। বধূর রূপের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। বধূর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনেই তাঁর পরম সুখ, অপার সন্তোষ।

বধূর আচার-আচরণ চাল-চলন সমস্ত ক্ষেত্রেই ত্রুটি আবিষ্কার করেন শাশুড়ি ঠাকুরানী। তাচ্ছিল্যের পরিমাণ বাড়ে। চলে বাচিক নির্যাতন। বধূর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। শাশুড়ির চোখে বধূর চলন-ফেরন ভালো নয়। তাতে না আছে শ্রী, না আছে ছন্দ :

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন।

তুর্কী ঘোড়া যেমন॥

বধূর হাঁটা-চলার ধরনটি তুর্কী ঘোড়ার মতো। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে শাশুড়ির ক্ষোভ ও অসন্তোষটুকু প্রকাশ পায়।

অন্যদিকে বধূর কণ্ঠস্বরও শাশুড়ির কাছে বিরক্তিকর। শাশুড়ি সে কণ্ঠস্বরে মাধুর্যের লেশটুকুও খুঁজে পান না। বধূর কণ্ঠস্বরকে শালিকের চীৎকারের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি :

বউয়ের গলার স্বর কেমন।

শালিক কেঁকায় যেমন॥

বধূর আচরণের সঙ্গে কখনও ঘোড়া, কখনও বা শালিক— ইতর প্রাণীদের এই যে তুলনা, এতে বধূর প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। এও তো এক ধরনের নির্যাতন।

শাশুড়ি ধমক দিয়ে বধূকে বাটনা বাটতে বাধ্য করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে বিজয়িনীর উল্লাস :

বউটি ভালো বটে।

টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে॥

লজ্জায় বধূ মুখ খোলে না। কিন্তু খাবার সময় বড়ো বড়ো গ্রাস মুখে তোলে। চালতার মতো গ্রাস। মুখের হাঁ দেখলে অবাক হতে হয়। শাশুড়ি স্বভাবতই বিদ্রূপপ্রবণা :

লাজে বউ হাঁ না করে।

চালতা হেন গেরাস ধরে॥

বধূ নির্বিকার থাকে। কথার জবাব দেয় না। বধূর এই নির্বিকারত্বও সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে :

বউ না বোবা,
বউ না বাবা।

শাশুড়ির চোখে বধূ অলক্ষুণে। হাতে-পায়ে লক্ষ্মী নেই। নতুন শাড়িটি কোনও কারণে ছিঁড়ে গেলে বধূকে শাশুড়ির ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়। শাশুড়ির কণ্ঠস্বরে প্রকাশ প্রায় ক্রোধ :

বউ নয় তো হীরে।
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি
আজ দিয়েছে ছিঁড়ে॥

হৃদয়হীনা শাশুড়ির কাছে বধূর সামান্যতম ত্রুটিও ক্ষমার অযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শাশুড়ির নিজের কোনও ত্রুটি, তা সে যত বড়োই হোক না কেন, নিতান্তই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর রূপে দেখা হয় :

বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা॥

বধূ যদি অসাবধানে 'শরা' ভেঙে ফেলে, তো এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় তা খবর হয়। কিন্তু শাশুড়ি যদি গরুকে জাবনা দেওয়ার মস্ত বড় পাত্র 'নাদা'-ও ভেঙে ফেলেন, তো তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। বধূ সুবিচার পায় না। তার ভাগ্যে জোটে শুধু নিন্দা আর অপযশ।

শরার কথায় আর একটি প্রবাদ মনে পড়ে :
ছোটো শরাটি ভেঙে গেছে, বড়ো শরাটি আছে।
নাচ কোঁদ কেন বউ, আমার হাতের আটকাল আছে॥

বধূকে শাশুড়ি ছোটো শরার মাপে ভাত দেন। ছোটো শরাটি ভেঙে গেলে বধূ উল্লসিতা হয়। সে ভাবে এখন থেকে বড়ো শরার মাপে তাকে ভাত দেওয়া হবে। আসলে ছোটো শরার মাপে তাকে যে ভাত দেওয়া হয়, বধূর ক্ষুধা উপশমের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। শাশুড়ির চোখে পড়ে বধূর উল্লাস। তিনি জানিয়ে দেন, ছোটো শরাটি ভেঙে গেলে কী হবে, তাঁর হাতের আন্দাজ আছে। ভাতের পরিমাণ বাড়বে না। বধূর ওপর এভাবেই লাঞ্ছনা চলে। চলে নির্যাতন। বধূ নির্যাতিতা হয়।

শাশুড়ির ধারণা : 'ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে'। সেই ধারণা বাস্তবায়িত হয় বৈকি! বধূ অত্যাচারিতা হয়। 'ঝি-কে মেরে বউকে শেখানো'-র চেষ্টাও দেখা যায়। বধূকে ভীতি প্রদর্শনের সূক্ষ্ম প্রয়াস আর কী! বধূ তাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

প্রতিবেশিনীর সামনে বধূর প্রতি শাশুড়ির দরদের অন্ত নেই। প্রতিবেশিনীদের শুনিয়ে তিনি বলেন :

বউমা, ক্ষীর রইলো খাবে।

অন্যদিকে অন্যদের অজান্তে মৃদুস্বরে বধূকে তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেন না :

যদি খাবে তো যমের বাড়ি যাবে॥

বধূর প্রতি শাশুড়ির বিদ্বেষটুকু গোপন থাকে না। এ হল বধূ-লাঞ্ছনার সূক্ষ্ম কৌশল।

শাশুড়ির চোখে বধূ লজ্জাহীনা। প্রতিবেশিনীদের কাছে বধূকে লজ্জাহীনতার অভিযোগে অপদস্থকরণেই শাশুড়ির আনন্দ। ক্ষুরধার তাঁর রসনা :

কোণের বউড়ী বলে ভাতার ভাতার।

বাইরের লোকজনের কাছে বধূকে যতই নিরীহ ভালোমানুষ বলে মনে হোক না কেন, শাশুড়ির চোখে সে ডাকিনী ও বাঘিনীতুল্যা। সে স্বামীকে বশ করেছে ডাকিনী-মন্ত্রে। আর রাত্রে রমণে সে বাঘিনী হয়ে ওঠে। শাশুড়ি বধূর নিন্দায় মেতে ওঠেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শ্লেষোক্তি :

বউ নারে বউ না, গরল ডাকিনী।

দিন হলে মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী॥

শাশুড়ির মনে হয়, বধূর আগমনের পর জননীর প্রতি পুত্রের ভালোবাসা হ্রাস পেয়েছে। বধূ স্বামীকে বশীভূত করেছে। শাশুড়ির বিরুদ্ধে স্বামীকে সে কুমন্ত্রণা দেয়। শাশুড়ি তাই ধিক্কার দেন : 'কলির বউ ঘরভাঙানি'।

সন্দেহ নেই, বধূর নিন্দায় শাশুড়ির সুখ, বধূর লাঞ্ছনায় শাশুড়ির আনন্দ। বধূ-সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই শাশুড়ি-সমাজের। বধূ-নির্যাতনে শাশুড়ি-সমাজের ক্লান্তিহীন উৎসাহ।

বধূ-বিদ্বেষ শাশুড়ি-জীবনের মূলমন্ত্র। বধূ-নির্যাতনে শাশুড়ির সুখ। প্রবাদগুলির আড়ালে রয়েছেন বধূ-বিদ্বেষিণী বধূ-নির্যাতনকারিণী শাশুড়ি সম্প্রদায়। ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে, তর্জনে-গর্জনে, প্রবল পরাক্রান্তা শাশুড়ি ঠাকুরানীদের রোষ-রক্তিম মুখচ্ছবি এবং শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এ-সমস্ত প্রবাদে সহজলভ্য।

নির্যাতন যেমন আছে, তেমনি আছে নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া। নির্যাতনকারিণী শাশুড়ি নির্যাতিতা বধূ-জীবনের কণ্টক। শাশুড়ির হৃদয়ে বিদ্বেষ, মুখে বিষ, চোখে ভর্ৎসনা, আঁচলে ঘর-সংসারের চাবির গুচ্ছ। বধূ-চিত্ত স্বভাবতই ক্ষুব্ধ-পীড়িত। বধূর প্রতি শাশুড়ির বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা বধূর শাশুড়ি বিদ্বেষের উৎস। নির্যাতনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

শাশুড়ি চাতুর্যের আশ্রয় নিলে বধূও তাই প্রতারণায় প্রবৃত্ত হয় :

শাশুড়ি যেমন কাঠি মেপে খোয় দুধ।

বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ॥

রান্নাঘরের নাটক রীতিমতো জমে ওঠে।

বধূর প্রতিটি পদক্ষেপ শাশুড়ির নিয়ন্ত্রণাধীন। শাশুড়ি তার স্বাধীনতার পরিপন্থী। এহেন শাশুড়ির মৃত্যু যে তাই কাম্য হয়ে উঠবে তা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। সংলাপাত্মক একটি প্রবাদে মা-মেয়ের কথোপকথনে বধূর শাশুড়ি-বিদ্বেষের যে পরিচয় পাই, তার মূলে রয়েছে শাশুড়ির বধূ-বিদ্বেষ, বধূ-নির্যাতন :

একলা ঘরের গিন্নি হলি নাকি মা?

নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই, নড়ছে দুটো পা॥

শাশুড়ি এখনও জীবিতা। নিঃশ্বাস বইছে, পা দুটিও নড়ছে। বধূ সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত

হতে পারে না। মুক্তি তার কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু মুক্তি এখনও অনায়ত্ত। তার কণ্ঠে তাই সংশয়। আর অপেক্ষা। শাশুড়ির মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা।

মুমূর্ষু শাশুড়িকে ঘিরেও তাই বধূর দুশ্চিন্তা অব্যাহত। বধূ চায় শাশুড়ি-বিহীন সংসার। প্রবাদে প্রতিফলিত হয় স্বাধীনতার সেই স্পৃহাটুকু :

একলা ঘরের গিন্নি হবো।
চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাবো॥

শাশুড়ির মৃত্যু বধূকে শোকার্ত করে না। ঘোচে না শাশুড়ির প্রতি বিরূপতাটুকু। দিনের পর দিন বধূ শাশুড়ির নির্যাতন সহ্য করেছে। নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। দুঃখ-বেদনার স্মৃতিটুকু অব্যাহত। শাশুড়ির প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই, নেই ভালোবাসা। কিন্তু সমাজ আছে। আছে সমাজের মানুষজন। লোকনিন্দা সমালোচনা এসব তো মানতে হয়। শাশুড়ির জন্যে বধূকে তাই কাঁদতে হয়। চোখের জল ফেলতে হয়। না হলে লোকে নিন্দা করবে। লোক দেখানো শোকের অভিনয়টুকু করতে হয়। কিন্তু শাশুড়ির প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তোষ লুপ্ত হয় না। তাই সে বলে :

শাশুড়ি মল সকালে।
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদব আমি বিকালে॥

বধূর এই উক্তিতে কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়? বধূও তো রক্ত-মাংসের নারী। তার দুঃখ-বেদনা ক্ষোভ আর যন্ত্রণাকে অস্বীকার করি কীভাবে? শাশুড়ি তার প্রতি অত্যাচার কম করেন নি। পুত্রের বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বধূকে আপন করে নিতে পারেন নি। প্রতিনিয়ত তাকে ব্যঙ্গ করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। নানাভাবে অপমান করেছেন। মনের মধ্যে সবসময় বধূর প্রতি বিদ্বেষটুকু পোষণ করে রেখেছেন। বধূকে না দিয়েছেন শান্তি, না দিয়েছেন স্বস্তি। শাশুড়ির মৃত্যু ঘটেছে বলে কি সেসব মুছে যাবে? এত সহজে সবকিছু কি ভোলা যায়? বধূও ভুলতে পারে না। সমাজ শাশুড়ির জন্যে তার চোখের জল দেখতে চায়। কিন্তু তার নারীসত্তা আহত হয়। তাই সবদিক রক্ষা করে সে মনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয়।

লোকগীতিতেও নির্যাতনকারিণী শাশুড়ির দেখা পাই। একটি টুসুগীতে নির্যাতিতা বধূর শ্বশুরালয় গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। বধূর শাশুড়ি-ভীতিটুকু গোপন থাকে না :

ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মেচুরি।
আর যাব না শ্বশুরবাড়ি ধইরে মারে শাশুড়ি॥

পিতৃগৃহের দারিদ্র্যও সহনীয়, শাশুড়ির অত্যাচার-উৎপীড়ন অসহ্য। দৈহিক নির্যাতন বধূকে শ্বশুরগৃহের প্রতি বিমুখ করে তোলে।

লোকসমাজে প্রচলিত গল্প-কথাতেও বধূ-নির্যাতনের দৃষ্টান্ত সহজলভ্য। নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বিহঙ্গচারণা' গ্রন্থ থেকে এ ধরনের কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম গল্প : এক বউ ছিল, সে খুবই শান্ত। কিন্তু শাশুড়ি তাকে দেখতে পারত না। রাতদিন খাটাত। ভালো করে খেতে দিত না। একদিন সে নদীতে গেল কাপড় কাচতে। যাবার সময় কোলের ছেলেটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। নদীর ধারে ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে সে কাপড় কাচতে থাকল। কাপড় কাচতে কাচতে তার খেয়ালই ছিল না যে নদীর পাড়ে ছেলে শুয়ে

আছে। এদিকে কখন জোয়ার এসে ছেলেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তা সে টের পায়নি। যখন টের পেল, তখন সে ছেলের জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। ...বাড়িতে গিয়ে কী জবাব দেবে। ভয়ে-দুঃখে সে হয়ে গেল একটা পাখি। কী পাখি, না হাঁড়িকুড়ি পাখি।...

দ্বিতীয় গল্প : 'চোখ গেল' পাখি আগের জন্মে ছিল এক গেরস্থ ঘরের বউ। শাশুড়ির সঙ্গে মোটেই তার বনতো না। একদিন বৌ শাশুড়ির কথা না শোনায় শাশুড়ি ভীষণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে, তারপরে, গরম ছাঁকুনি (মতান্তরে 'খন্ত্রাবাড়ি') দিয়ে দিলে বউয়ের চোখ গেলে। একে চোখের জ্বালা, তারপর গরম জিনিসের ছেঁকা। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বউ একটা পাখি হয়ে উড়ে গেল।

তৃতীয় গল্প : 'চোখ গেল' আর 'বউ কথা কও' এই দুটি পাখি আগের জন্মে ছিল যথাক্রমে পুত্রবধূ ও শাশুড়ি। দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কেউ কাউকে দেখতে পারত না। একদিন বাড়িতে মুড়ি ভাজা হয়েছে। শাশুড়ি বউকে বললে, হাঁড়ির ভেতর মুড়ি তুলে রাখতে। বউ মুড়ি তুলতে গিয়ে লোভে পড়ে কিছুটা মুড়ি খেয়ে ফেলল। শাশুড়ি তা দেখে ফেলে। শাশুড়ি ভীষণ রেগে গিয়ে মুড়ি ভাজবার 'কুঁচি' (যা দিয়ে 'খোলা'র চাল নাড়া হয়) দিয়ে বউয়ের চোখ গেলে দিলে। যন্ত্রণায় বউ 'চোখ গেল' বলতে বলতে একটি পাখি হয়ে উড়ে গেল। বউ পাখি হয়ে উড়ে গেল দেখে শাশুড়ির ভারী অনুতাপ হল। দুঃখে তারও মৃত্যু হল। দেবতারা তাকেও করে দিলে পাখি। সে তখন পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে বলতে থাকল, বউ কথা কও!

চতুর্থ গল্প : পানকৌড়ি পাখি আগে ছিল এক গেরস্থ ঘরের বউ। তার গলাটা ছিল বেজায় লম্বা, আর গায়ের রঙ ভারি কালো। রূপের 'ছিরি' দেখে স্বামী তাকে ভালোবাসত না, শাশুড়ি নানারকম অত্যাচার করত। বউটি মাছ খেতে খুবই ভালোবাসত, কিন্তু বাড়িতে মাছ রান্না হলেও শাশুড়ি তাকে মাছ খেতে দিত না। একদিন বাড়িতে অনেক মাছ রান্না হয়েছে। কিন্তু রোজদিনকার মতো সেদিনও শাশুড়ি তাকে মাছ খেতে দিলে না। অথচ বউটির ভারি লোভ হলো মাছ খেতে। রাগে-দুঃখে সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলে। ডুবে মরবার পর সে হলো পানকৌড়ি পাখি। সে কালো বউ ছিল, তাই পানকৌড়ির রঙও কালো; বউটির গলার মতোই পানকৌড়ির গলা লম্বা। শাশুড়ি মাছ খেতে দিত না বলেই পানকৌড়ি সাধ মিটিয়ে কেবল মাছই খায়।

প্রতিটি গল্পেই বধূ অত্যাচারিতা। অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পের বধূ নির্দোষ নয়। কিন্তু অপরাধের তুলনায় অত্যাচারের পরিমাণ বেশি। গল্প দুটিতে শাশুড়িব নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি গল্পেই বধূ শেষপর্যন্ত পাখিতে রূপান্তরিত। তৃতীয় গল্পে শুধু বধূ নয়, শাশুড়িরও পাখিতে রূপান্তর ঘটেছে।

লোকসাহিত্যে লোকসমাজেরই প্রতিফলন। লোকসমাজে বধূ-বিদ্বেষ, বধূ-নির্যাতন অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার। স্বভাবতই লোকসাহিত্যে তা স্থান পেয়েছে। প্রশ্ন হলো, শাশুড়ির এই বধূ-বিদ্বেষের কারণ কী? কেন বধূ শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিতা? এর একাধিক কারণ আছে। বধূ সবসময় যে নির্দোষ তা নয়। বধূব দোষ-ক্রটিও কিছু আছে বৈকি। বধূ যদি সাংসারিক কাজে-কর্মে শৈথিল্য দেখায় তাহলে শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হতেই পারেন। স্মরণযোগ্য, বধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ির অভিযোগ

কাজ নেই বউ অকাজ করে।

চালে ধানে এক করে।।

অর্থাৎ, কাজের বদলে কাজ বাড়িয়ে দেয়। অথবা বধূর হুজুগ-প্রিয়তা সম্পর্কে শাশুড়ির বক্র কটাক্ষ :

একে বউ নাচনী।

তায় খেমটার বাজনি।।

স্বভাবেই বধূ হুজুগপ্রিয়, তারপর যদি খেমটা নাচের বাজনা বাজে, তবে তো কথাই নেই। ঘরে ধরে রাখাই দায়। ভর্ৎসনাযোগ্য অভিযোগ আরও আছে। বধূ অলস, দায়িত্বজ্ঞানের বালাই নেই। সমস্ত দিনটি হেসে-খেলে কাটিয়ে দেয়। রাত্রে অন্ধকারে কাপাস তুলোয় প্রদীপের সলতে তৈরি করতে থাকে। দিনের বেলা তার সময় হয় না। এক্ষেত্রে শাশুড়ি যদি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাহলে বলার কী আছে? শাশুড়ি তাই বধূর সমালোচনা করেন :

দিন গেল হেসে খেলে।

রাত হলে বউ কাপাস ডালে।।

শাশুড়িকে বোধকরি দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু তাই সব নয়। অন্য কারণও রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ, মনস্তাত্ত্বিক কারণ। বধূ ভিন্ন পরিবারের, প্রায়শই ভিন্ন গোত্রের কন্যা। আচার-আচরণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, রুচি ও মানসিকতায় দুটি পরিবারে ভিন্নতা ঘটাই স্বাভাবিক। আর এই ভিন্নতাহেতু মতপার্থক্যের উদ্ভব, সংঘাতের সৃষ্টি, নির্যাতন, নিপীড়ন। নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগে। কথাটি কিন্তু অনেকেই বিস্মৃত হন। সে সময়টুকুও দিতে চান না। নববধূর ভুল ভ্রান্তি, পরিবেশ-পরিবর্তনজনিত আড়ষ্টতা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সহানুভূতির বদলে উষ্মা প্রকাশ করেন। বধূ যে যন্ত্র নয়, রক্ত-মাংসের মানবী, তা ভুলে যান। নববধূর আবাল্যের প্রণয়-স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-আহ্লাদ এসবের সন্ধান ক'জনই বা রাখতে চান? 'বধূ হলো দাসী'— এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তার ওপর ক্রমাগত দমন-পীড়ন চলতে থাকে।

অনেক সময় কন্যার পিতা-মাতা নিজেদের পারিবারিক পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা আর সামাজিক অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়ে নাগালের বাইরে হাত বাড়ান। অপেক্ষাকৃত উঁচুতলার পাত্রটিকে ধরতে চান। পাত্রপক্ষের অযৌক্তিক অশোভন দাবিপূরণের আশ্বাস দেন। যা কিনা তাঁদের সাধ্যাতীত। কন্যাকে সুখী করার ইচ্ছায়, নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে নেওয়ার গোপন আকাঙ্ক্ষায় কন্যার বিবাহোত্তর জীবনকে তাঁরা বিড়ম্বনায় ভরিয়ে তোলেন। নিজেরাও বিড়ম্বিত হন।

মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। বধূর আবির্ভাবে মাতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসার হ্রাস, বধূর প্রতি পুত্রের অধিকতর মনোযোগ (স্মরণীয় : 'গিন্নির হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা') ইত্যাদি ধারণা শাশুড়ির বধূ-বিদ্বেষের মূলে কিছুটা কার্যকর। কর্ত্রীত্ব হারানোর আশঙ্কাও তাঁকে বধূ-বিদ্বেষিণী করে তোলে। প্রবাদে তাই আক্ষেপ ধ্বনিত হয় :

পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এল।

সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নিপনা গেল।।

দাবি রাখে। লোকসাহিত্যে এদের ভূমিকাও বিশ্লেষণযোগ্য।

লোকসমাজের বিশ্বাস, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাত্রে বিধাতাপুরুষ শিশুর ললাটে যে লিখন লিখে দেন তা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ হলো ভাগ্যলিপি বা ললাট লিখন। আমাদের অদৃষ্টবিশ্বাস বস্তুতপক্ষে এই ললাট লিখনেই বিশ্বাস। সাধারণভাবে তা অপ্রতিরোধ্য। কথায় বলে 'ললাটের লিখন না যায় খণ্ডন'। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'মালঞ্চমালা' গল্পে দেখা যায় ছয়-ষষ্ঠীর রাতে শিশু রাজপুত্রের শিয়রে ধারা তারা বিধাতার আবির্ভাব ঘটেছে। শিশুর ললাটে তাঁরা ভাগ্যলিপি লিখে দিয়েছেন। গল্পে পাই :

> ঘরে গিয়া প্রথম, — ধারা — বিদ্যার আঁক, বুদ্ধির আঁক, ধন, জন, যত ঐশ্বর্য্যের আঁক দিলেন। হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম, সকল, দেখিয়া, টেখিয়া, এক প্রহর ধরিয়া লিখিয়া লিখিয়া, — য— ত — কলম ধারার, ফুরাইয়া গেল!
>
> ফুরাইয়া গেলে, তারা আসিয়া কলম নিলেন। নিয়া, এক কলম দিয়া কপালে ছোঁয়াইতেই, তারা, কলম ফেলিয়া দিয়া উঠিলেন :
>
> উঠিলেন! — ধারা বলেন, — "কি দেখিলে?" মুখ ফিরাইয়া তারা বলিলেন,—"আর কি দেখিব, চল যাই। রাজপুত্রের আয়ু মাত্র বারো দিন।"

ধারা তারাই বিধাতা। এঁরাই বিধান দেন। ভাগ্যলিপি অখণ্ডনীয়। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে কোটালকন্যা মালঞ্চমালা। বারো বছরের মালঞ্চমালার সঙ্গে বারো দিনের রাজপুত্রের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের রাত্রেই রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মালঞ্চমালা মৃত রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে তুলেছে। সেজন্যে অবশ্য অনেক দুঃখ-কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মালঞ্চমালা প্রমাণ করেছে যে লোকবিশ্বাস অনড় নয়। ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে ললাট লিখনকে ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। এখানেই 'মালঞ্চমালা' গল্পের অনন্যতা। দেখা গেল, যে লোকসমাজ ললাট-লিখনে বিশ্বাসী, সেই লোকসমাজই ললাট-লিখনের ওপরে স্থান দেয় ইচ্ছাশক্তিকে। এই ইচ্ছাশক্তি পুরুষকারেরই নামান্তর। মালঞ্চমালার ত্যাগ ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও সংগ্রামশীলতায় পুরুষকারের পরিচয়ই লভ্য। অদৃষ্ট আর পুরুষকারের দ্বন্দ্ব তো চিরন্তন। লোকসমাজ একদিকে যেমন অদৃষ্টবিশ্বাসী, অন্যদিকে তেমনি পুরুষকারে আস্থাশীল। আলোচ্য গল্পে এই দ্বিমুখী প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। লোকবিশ্বাসের আলোচনায় 'মালঞ্চমালা' গল্পটি তাই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কালরাত্রি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিয়ের পরবর্তী রাত্রি হলো কালরাত্রি। কালরাত্রিতে নবদম্পতির সহবাস নিষিদ্ধ। একত্রে কোথাও যাত্রা নিষিদ্ধ। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এর কারণটি নির্দেশিত। সিংহল-রাজকন্যা সুমিত্রাকে বিয়ে করে রাজা দশরথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে কালরাত্রিতে সুমিত্রার সঙ্গে সহবাস করেন। সেই অপরাধে তাঁকে অশেষ দুঃখভোগ করতে হয়। পুত্র-বিচ্ছেদে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। কালরাত্রি সম্পর্কিত এই লোকবিশ্বাস থেকেই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র 'মলুয়া' পালায় বলা হয়েছে —

> কালরাত্রে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা।
> এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা।।

কালরাত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এমন কী কোথাও যাত্রাও করতে নেই। তাতে কালক্ষয় হয় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে।

সপ্তাহের বিভিন্ন বারকে ঘিরে নানা ধরনের লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়। প্রবাদ সাহিত্য থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রবাদে সোমবার এবং বুধবার শস্যের গোলায় হাত দিতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রয়োজনে ধার করে ভাত খেতে বলা হয়েছে —

সোমে বুধে না দিও হাত।
ধার করে খেও ভাত।।

কোথাও যাত্রার পক্ষে মঙ্গলবারের উষা মুহূর্ত এবং বুধবার শুভ। প্রবাদ সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় —

মঙ্গলের উষা বুধে পা।
যথা ইচ্ছে তথা যা।।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র 'মহুয়া' পালায় শুক্রবার যাত্রার পক্ষে শুভদিন রূপে গণ্য। হুমরা বেদে তার দলবলসহ কোনও এক শুক্রবার খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে —

শুক্কুর বাইর্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া।
দলের লোক চলে যত গাট্টি বুচ্‌কা লইয়া।।

শুক্রবার হল জুম্মাবার অর্থাৎ পবিত্র বার। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে এ দিনটি শুভ ও পবিত্র। মনে হয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাবেই এখানে শুক্রবারের উল্লেখ ঘটেছে।

কোনও কোনও মাসকে ঘিরেও বিশ্বাস-সংস্কার বিদ্যমান। যেমন, প্রবাদ জানিয়ে দেয় —'চৈতে কুয়া ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান'। অর্থাৎ, চৈত্র মাসে কুয়াশা এবং ভাদ্রমাসে বন্যা হলে মড়ক দেখা দেয়। প্রসঙ্গত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র 'মলুয়া' পালার ভাদ্র মাস সম্পর্কিত লোকসংস্কারটির উল্লেখ করা চলে —

ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে দেবকার্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা।।

ভাদ্র মাসে বিয়ে হয় না। বাংলার লোকসমাজে এ মাসে বিয়ে নিষিদ্ধ। মলুয়ার অভিভাবককুল তাই এ মাসে মলুয়ার বিয়ে দেয় নি। কৃষিজীবী লোকসমাজ এ সময় কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকে। সেজন্যেই বোধকরি ভাদ্র মাসে বিয়ে নিষিদ্ধ।

ব্যক্তি সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংস্কারও বিদ্যমান। সকালবেলা নিঃসন্তান ব্যক্তির মুখদর্শন অশুভ। তাতে নাকি দিনমানটা নানাভাবে দুঃখ পেতে হয়, অন্ন জোটে না। প্রবাদে বলে — 'আটকুড়ার মুখ দেকলি, দিন যায় উপআসে।' 'আটকুড়া' অর্থাৎ নিঃসন্তান। 'উপআসে' অর্থাৎ উপবাসে। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-র 'মধুমালা' গল্পে সকালবেলা নিঃসন্তান রাজার মুখ দেখে ঝাড়ুদার আক্ষেপ করেছে —

রাত না পোহা'তে দেখিলাম আঁটকুড়ে'র মুখ,
ভোজনে নাই সুখ, কপালে আজ অনেক দুখ!

স্বয়ং রাজাও সে আক্ষেপে বিচলিত হয়েছেন। বলেছেন — "হাঃ —! খোলার মালী

ঝাড়ুদার, তাহার কাছেও আমি অনামুখো, — আমার মুখ অযাত্রা!" গল্পে পাই : 'রাজা মালীকে কিছু বলিলেন না। কপাল-দোষে ঘাঁটকুড়ে হইয়াছেন, রাজা আপন মন আপনি 'সম্বরিয়া', ঘরের কপাটে খিল দিলেন। ... রাজ-রাজত্ব বিচার-আচার পালন-পাট সব বন্ধ। সাত সাত দিন গেল। — উজীর নাজীর পাত্র মিত্র রাজ্যের সকল লোক রাজার দুয়ারে। রাজার মুখে এক কথা — "লোক-সমাজে আর মুখ দেখাইব না; আর প্রাণ রাখিব না!" শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিধাতা পুরুষের দয়ায় রাজা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস-সংস্কার আশ্রয়েই এ গল্পের সূচনা। সেদিক থেকে গল্পটিতে এই বিশ্বাস-সংস্কারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

'মধুমালা' গল্পে নিঃসন্তান রাজা দৈব-কৃপায় পুত্রের জনক হয়েছেন। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশধারী বিধাতা পুরুষের নির্দেশে বংশ-পাখির মাংস খেয়ে সুযোগ্য বংশধর লাভ করেছেন। এ ধরনের দৈব বিশ্বাসের কথা আরও অনেক গল্পে দেখা যায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের সাতরানীও সন্তানহীনা ছিলেন। এ অবস্থায় —

একদিন রানীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, — এমন সময়, এক সন্ন্যাসী যে, বড়রানীর হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন, — "এইটি বাটিয়া সাত রানীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।"

সন্ন্যাসীর কথা মিথ্যা হয়নি। রানীরা সন্ন্যাসী-প্রদত্ত শিকড় বেটে খেয়ে যথাসময়ে পুত্রবতী হয়েছেন। এ ধরনের গল্পের সংখ্যা কম নয়। দৈব-কৃপায় সন্তানলাভের নিদর্শন এগুলি। অর্থাৎ লোকবিশ্বাসের নিদর্শন।

কোথাও যাত্রাকালে মৃতদেহ দেখা শুভ লক্ষণ। লোকবিশ্বাস, এর ফলে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। লালবিহারী দে সংকলিত 'Folktales of Bengal' গ্রন্থের 'Adventures of Two Thieves' গল্পে ডাকাতের দল ডাকাতি করতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে গাছের ওপর থেকে ঝুলন্ত শব দেখে দলের সর্দার তাই বলেছে : "বাঃ, আজকের কাজের শুরুতে দেখছি ভারি শুভ লক্ষণ! ব্রাহ্মণরা আর পণ্ডিতরা বলেন যাত্রারম্ভে মড়া দেখা ভালো!" (বাংলার উপকথা, অনুবাদ: লীলা মজুমদার) ডাকাতের দল বিনা বাধায় ডাকাতি করে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেছে। শুভ লক্ষণই বটে!

লোকসমাজ দেবতাকেও মানে, অপদেবতাকেও মানে। ভূতের বাসস্থানের হদিশ পাই একটি প্রবাদে: 'ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা'। ভূত-পেত্নীর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে ছড়ার সাহায্যও নিয়েছে লোকসমাজ। ছড়াটি সুপরিচিত:

ভূত আমার পুত,
পেত্নী আমার ঝি —
রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে
করবি আমার কী?

বিশ্বাস, রাম-লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করলে ভূত পালিয়ে যায়। রাম-লক্ষ্মণের নামের এমনি মহিমা! ভূত-ভীত মানুষ যখন রাম-লক্ষ্মণের নাম নেয় তখন তা সংস্কারে পর্যবসিত হয়।

ভূত তাড়ানোর আরও অনেক উপায় আছে। একটা গল্প থেকে তার কিছু নমুনা

দেওয়া যাক। গল্পটির নাম 'ভূতে পাওয়া'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত-পেত্নী' গল্প-সংকলনে এটি পাওয়া যাবে। গল্পে দেখা যায়, পেঁচোর মা হঠাৎ ভূতের সামনে পড়ে গেল। কী করে কী করে ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়লো যে, কাপড়খানা উল্টে পরলে ভূত পালিয়ে যায়। তাই সে 'রাম রাম' বলে কাপড়খানা উল্টে পরলো। ব্যস্, কোথায় উধাও হয়ে গেল ভূত! ভূতটাকে আর সে দেখতে পেলো না। পেঁচোর মা ভূত তাড়ানোর জন্যে দু'টি সংস্কারের সাহায্য নিয়েছে। প্রথমত 'রাম'-নাম উচ্চারণ করেছে; দ্বিতীয়ত কাপড়খানা উল্টো করে পরেছে। লোকবিশ্বাস থেকেই এহেন লোকসংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে।

সরষে পড়া বাণ হ'ল ভূত তাড়ানোর এক মোক্ষম অস্ত্র। আলোচ্য সংকলনের 'পেঁচো' গল্পে এই সংস্কারটির পরিচয় মেলে। পেঁচো কোনও এক ভূতের নাম। সরষে পড়া বাণ খেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, — 'মশায় গো, গণ্ডী খুলে দিন, আমি এখনি যাচ্ছি, এমন কাজ কখনও করবো না।'

লোকবিশ্বাস, ভূত-পেত্নীরা ইচ্ছেমতো নিজেদের অবয়ব ছোটো-বড়ো করতে পারে। লালবিহারী দে-র 'A Ghostly Wife' গল্পে দেখা পাই এক শাঁখচুন্নির, যে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তার স্ত্রীর ছদ্মবেশে বাস করছে। অদ্ভুত তার আচরণ। 'পাশের ঘর থেকে বৌকে কিছু আনতে বললে, সেখানে হেঁটে যেতে যতখানি সময় লাগে তার আগেই জিনিস এসে হাজির! পাশের ঘরে না গিয়ে বৌ দরজা থেকে লম্বা এক হাত বাড়িয়ে জিনিস এনে উপস্থিত করত।' (বাংলার উপকথা। অনুবাদ: লীলা মজুমদার) লোকবিশ্বাস, ভূতপেত্নীরা পোড়া হলুদের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আলোচ্য গল্পেও 'যেই না হলুদের টুকরোয় আগুন জ্বালিয়ে বৌয়ের কাছে আনা হল, সে বিকট চিৎকার করতে করতে সেখান থেকে পালাল।' (ঐ) বিশ্বাস এখানে সংস্কারে পরিণত।

লোকসমাজে এ ধরনের একটা বিশ্বাস চালু আছে যে বিশেষ কোনও নদী বা পুকুরের কাছে প্রার্থনা জানালে উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যে বাসন-কোসন ধার পাওয়া যায়। পাবনা জেলায় করতোয়া নদীকে ঘিরে এ জাতীয় লোকবিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন মুহম্মদ ফরিদউদ্দীন তাঁর 'কাহিনী কিংবদন্তী' গ্রন্থে। লোকবিশ্বাস থেকে জন্ম হয়েছে কিংবদন্তীর। একটি গল্পের উদ্ভব ঘটেছে। গল্পটি এ রকম: একটা সময় ছিল যখন বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাসনপত্রের প্রয়োজন হলে শুদ্ধচিত্তে এই নদীর কাছে প্রার্থনা জানালে অনুষ্ঠানের দিন নদীতীরে প্রচুর বাসনপত্র জমা হতো। অনুষ্ঠান-শেষে বাসনগুলি নদীতীরে রেখে এলে সেগুলি আপনিই নদীর জলে তলিয়ে যেত। একদিন এক রাজবাড়িতে উৎসব উপলক্ষে নদীর কাছ থেকে বাসনপত্র নেওয়া হলো! কিন্তু কাজের শেষে ফেরৎ দেওয়ার সময় রাজবাড়ির এক দাসী একটি বাটি লুকিয়ে রাখলো। ফলে নদীতীরে নামিয়ে দেওয়া বাসনগুলি নদীতীরেই পড়ে রইলো। নদী সেগুলো নিলো না। রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন। এক দীপ্তিমান পুরুষ রাজাকে এজন্যে তিরস্কার করছে। দিনের বেলা রাজা খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে একজন দাসী একটি বাটি লুকিয়ে রেখেছে। বাটিটি নদীতীরে অন্য বাসনগুলির সঙ্গে রেখে আসা হলো। এবার সব বাসন নদীতে মিলিয়ে গেল। তারপর থেকে নদীর কাছে প্রার্থনা জানালেও নদী আর বাসন দেয় না। দাসীর হঠকারিতায় করতোয়া নদী বাসন দেওয়া বন্ধ করলো। কিন্তু গল্পটি থেকে গেল।

পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই যাদু-বিশ্বাসের ভিত্তিটি পুরনো। বাংলার লোকসমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' গল্প-সংকলনের 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা' গল্পটি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। কাঞ্চনমালা রানী, আর কাঁকনমালা দাসী। কিন্তু চাতুর্য-কৌশলে দাসী হয়েছে রানী, রানীকে করেছে দাসী। এ অবস্থায় রাজার রাখালবন্ধু যাদুশক্তি-সহায়তায় দাসীর শাস্তিবিধান করেছে, রানীর হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিয়েছে। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'কাঞ্চনমালা' গল্পে যাদুশক্তির অধিকারিণী মালিনী মন্ত্রবলে রাত্রির গতি স্তব্ধ করেছে —

> কুলা ধুলা আঙ্গটপাত তে-পথ পথে বিছাইয়া আস্ত মান-পাতা বোন্-ঝির মাথায় ধরিয়া, তিন শীষ দূর্ব্বা ছড়াইয়া মালিনী মন্ত্র ডাকিল। মন্ত্রে, রাত আর পোহায় না!

লালবিহারী দে-র 'Folktales of Bengal'-এ 'The Story of Rakshasas' নামে যে গল্প আছে তাতে দাসীর ছদ্মবেশে রাক্ষসী নৌকোয় চড়ে তিনটি বার আঙুল মট্‌কে, মন্ত্র উচ্চারণ করেছে —

> হিজল-কাঠের নাও গো আমার,
> মন-পবনের দাঁড়!
> যেথায় কেশবতী সিনান করে,
> চল সেই ঘাটের পার।

আর — 'বলতে না বলতে জলের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো নৌকো ছুটে চলল। কত নগর, কত গ্রাম পেছনে পড়ে থাকে, নৌকো ছুটে চলে। অবশেষে একঘাটে এসে নৌকো নিজেই ভিড়ল। দাসী বুঝল এই ঘাটে তবে কেশবতী সিনান করে।' (বাংলার উপকথা। অনুবাদ: লীলা মজুমদার)

সন্দেহ নেই, রাক্ষসী যাদুশক্তির অধিকারিণী। সে তিনবার আঙুল মটকেছে। তিন সংখ্যাটি বাংলার লোকসমাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিশি তিনবারের বেশি কাকেও ডাকে না। আমরা তিন সত্য করে শপথ নিই। তিন শত্রু দিতে নেই। তিন বামুনে যাত্রা নেই। তিন সংখ্যাটির সঙ্গে রয়েছে সংস্কারের যোগ।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'শীত-বসন্ত' গল্পে দুয়োরানীর মাথা পরিষ্কারের নাম করে সুয়োরানী তার মাথায় একটি ওষুধের বড়ি গুঁজে দিয়ে তাকে টিয়াপাখিতে রূপান্তরিত করেছে। কালক্রমে সেই টিয়াপাখি এক রাজকন্যার আশ্রয় পেয়েছে। একদিন রাজকন্যা টিয়াকে স্নান করাতে গেলে ওষুধের বড়িটি টিয়ার মাথা থেকে মাটিতে পড়ে গেল। অমনি টিয়া আবার দুয়োরানীতে রূপান্তরিত হলো। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'কিরণমালা' গল্পে অরুণ আর বরুণ মায়াপাহাড়ে গিয়ে পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বোন কিরণমালা ঝরনার জল ছিটিয়ে তাদের আবার মানুষে রূপান্তরিত করেছে। এ ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ সবই রূপান্তর-বিশ্বাসের উদাহরণ। বিশ্বাসটি অত্যন্ত পুরনো। সাধারণত যাদু-বিশ্বাসের সঙ্গে এর যোগ। মানুষ পাখি হচ্ছে, মানুষ পাথর হচ্ছে, আবার স্বাভাবিক রূপটি ফিরে পাচ্ছে।

লালবিহারী দে-র 'Folktales of Bengal'-এর 'The man who wished to be perfect' গল্পে দেখি —

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে, অন্দরমহলের উঠোনে বড় রাজপুত্র একটি গাছ পুঁতে মা-বাবাকে আর ভাইকে বলল, "এই গাছটি আমার প্রাণ। যতক্ষণ একে সবুজ সতেজ দেখবে, বুঝবে আমি খুব ভালো আছি। যদি কখনো দেখ গাছের খানিকটা জায়গা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুঝবে আমার অবস্থা ভালো নয়। গাছটার আগাগোড়া শুকোলে বুঝবে আমি আর নেই।" (অনুবাদ : লীলা মজুমদার)

পরবর্তীকালে রাজপুত্র যখন বিপদে পড়েছে, সত্যিই তখন গাছের পাতা শুকোতে শুরু করেছে। গাছের সঙ্গে যোগ রয়েছে রাজপুত্রের। রাজপুত্রের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছেরও অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। গাছটি যে পুঁতলো, তার সঙ্গে গাছের একটি নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হলো। গাছ হয়ে উঠলো জীবন চিহ্ন (Life Token)। গাছের অস্তিত্বের সঙ্গে রাজপুত্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারে একের পরিণতির সঙ্গে অন্যের পরিণতি সম্পর্কযুক্ত। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া এবং তাসমানিয়ার আদিম মানুষজনের মধ্যেও এ ধরনের বিশ্বাস সক্রিয়।

সে যাই হোক, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের আলোচনায় লোকসাহিত্যের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বেশ বোঝা যায়।

বিশ শতকের বাংলার লোকসাহিত্যচর্চা : ছড়া

বাংলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে চর্চা প্রথম শুরু হয় উনিশ শতকে। পথ দেখান খ্রিষ্টান মিশনারি সম্প্রদায়। যুগপৎ সংগ্রহ ও আলোচনা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। শিক্ষিত বাঙালিসমাজ অবশ্য এসবের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথই এ-বিষয়ে প্রথম শিক্ষিত বাঙালিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি বাউলগীতি-সংকলনের সমালোচনা উপলক্ষে তিনি দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভূত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাউলের গান' প্রবন্ধে তিনি 'বাঙালি হৃদয়ের যথার্থ ভাব ও ভাষা'-র' উল্লেখ করেন। দেশের প্রকৃত সাহিত্যের সন্ধান দেন। দেশের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে সে-সাহিত্যের অন্তরের যোগ।

১৩০১ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[২] ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় প্রকাশিত হয় 'ছেলেভুলানো ছড়া'। ১৩০২ সালের কার্তিকে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'মেয়েলি ছড়া'।[৩] প্রবন্ধগুলি পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। আপাততুচ্ছ ছড়াগুলির রসসৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ যে-অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। শিক্ষিত বাঙালিসমাজের একাংশ লোকসাহিত্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণাদি সংগৃহীত হয়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। দেখা দেয় আবেগ-উৎসাহ-উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথই যে এই প্রেরণার মূলে তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ শতক শুরু হয় ওই আবেগ-উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। লোকসাহিত্যচর্চায় জোয়ার আসে। ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা-গীতিকা-কথা প্রভৃতি সংগ্রহের পাশাপাশি সেগুলি নিয়ে

সংকলন আর আলোচনাও হতে থাকে।

বিশ শতকের ছড়াচর্চার ধারাটিকে সংগ্রহ সংকলন ও সমীক্ষা— এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। অবশ্য বহুক্ষেত্রেই সংগ্রহ ও সমীক্ষা বা সংকলন ও সমীক্ষা একত্রে দেখা যায়। সেজন্য সুস্পষ্ট বিভাগে কিছু অসুবিধা আছে।

১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় প্রকাশিত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আবেদন জানিয়েছিলেন:'এক্ষণে সাহিত্য পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্যে সাহায্য করিবেন'।[৪] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় ১৩১২ সালের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতেও তিনি বলেছিলেন : '...গ্রাম্য ছড়া, ছেলেভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে...'।[৫] রবীন্দ্রনাথের আবেদন ব্যর্থ হয়নি। লোকসাহিত্যের বিবিধ উপকরণ সংগৃহীত হতে থাকে। সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে দেশাত্মবোধের সুর প্রবল হয়ে ওঠে। দেশাত্মবোধের তাগিদ ওই সমস্ত সংগ্রহ-সংকলন-সমীক্ষাতেও প্রকাশ পায়।

ছড়া সংগ্রহের একটি তালিকা এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। ১৩০৯-এর 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র দ্বিতীয় সংখ্যায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'চট্টগ্রামী ছেলেভুলান ছড়া'-য় ৭৮টি ছড়া প্রকাশিত হয়। ১৩০৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের 'কাহিনী' প্রবন্ধে লোককথা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বাংলা ছড়া ও সমধর্মী ওড়িয়া ছড়া প্রকাশিত হয়। ১৩০৯-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বান্ধব' পত্রিকায় শ্রীমৎ কল্যাণ ভট্টের 'তারপর-তারপর' প্রবন্ধে পাই কয়েকটি ঘুমপাড়ানি ছড়া। ব্রজসুন্দর সান্যালের 'শরৎ-কালী' প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩১০) হরগৌরী-বিষয়ক ছড়া সংগৃহীত। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য সংগৃহীত কৃষ্ণের ননীচুরির ছড়া প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র দ্বিতীয় সংখ্যায় 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' শিরোনামায়। এগুলি পটের ছড়া বলেই মনে হয়। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য সংগৃহীত আরও কয়েকটি ছড়া প্রকাশিত হয় 'গ্রাম্য ছড়া' প্রবন্ধে (ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৩)। অন্যান্য সংগ্রহ : বদর-পীরের ছড়া, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪। বঙ্গের পৌষ সংক্রান্তি (এ বিষয়ক ছড়া), হরগোপাল দাসকুণ্ডু, প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮। পৌষ সংক্রান্তি (এ বিষয়ক ছড়া), শশিভূষণ দত্ত, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮। রাজবংশীদিগের কথা (পুজোর মন্ত্র-ছড়া), আশুতোষ বাগচী, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৮)। পৌষ সংক্রান্তি (এ বিষয়ক ছড়া), নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, চৈত্র ১৩১৮। পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন (এ বিষয়ক ছড়া), কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, চৈত্র ১৩১৮। পৌষ সংক্রান্তি (এ বিষয়ক ছড়া), জগৎমোহিনী দেবী, চৈত্র ১৩১৮। ব্রতমন্ত্র (ব্রতের ছড়ার কথান্তর), রেণুকাবালা দাসী, ভারতী, আষাঢ় ১৩১৯। ব্রতমন্ত্র (ব্রতের ছড়া), রেণুকাবালা দাসী, ভারতী, ভাদ্র ১৩১৯। বরিশালে নবান্ন (নবান্নের ছড়া), মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), মাঘ ১৩২০। ভাদুপরব (ভাদুর ছড়া), জীবনহরি সামন্ত, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২১। প্রাচীন পল্লিসংগীত ও কবিতা, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২৭। তোষলা বা তুষু পূজা, রাধারমণ চক্রবর্তী, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৯। বারোমেসে ছড়া, উমাপদ

মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩২। গাছ নোয়াবার ছড়া, উমাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২। নদীয়া থেকে সংগৃহীত মেয়েলি ছড়া, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৭। নদীয়া ও যশোহরের গাজনগীতি (আসলে গাজনের ছড়া), শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাঘ-চৈত্র ১৩৩৭। মাঘমণ্ডল, কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৪। রাজনগর ধ্বংসের কবিতা (বিবরণধর্মী ছড়া), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৫। নিরানব্বই সনের গিরাইব কবিতা (বিবরণধর্মী ছড়া), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৬। দেশপূজার ছড়া, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৭। পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন (গাজনের ছড়া), তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অলকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮। প্রাচীন ছড়া, মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন, বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন ১৩৪৮। পল্লিগ্রামে হ্যাঁচড়া পূজার ছড়া, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৪৯। ইটাকুমারের ছড়া, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৪। বসুধারা ব্রত, বেলা দে, বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৪। বাংলার মেয়েদের ব্রত, মিনতি মিত্র, বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। পল্লির বারোমাস্যা, তুলসীদাস সিংহ, বসুধারা, ১৩৬৫-৬৬। হেটো কবির ছড়া, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ, ২১ বৈশাখ, ১৩৮০। মানভূমের কিছু ছড়া ও গান, অরুণপ্রকাশ সিংহ, ছত্রাক, টুসু ও নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২-৮৩; ছেলেভুলানো ছড়ার সংগ্রহ। মানভূমের কিছু ছড়া ও গান, অরুণপ্রকাশ সিংহ, ছত্রাক, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩, খেলার ছড়ার সংগ্রহ। মনোভূমে মানভূম, শচীন্দ্রনাথ দরিপা, ছত্রাক, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৫, স্থানাশ্রয়ী ছড়ার সংগ্রহ। তালিকা থেকে বোঝা যায়, সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়েছে ব্রতের ছড়া, তারপর ছেলেভুলানো ছড়া। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য ছড়া। তাতে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ছড়াগুলি সংগৃহীত হয়েছে উভয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। অবশ্য সংগ্রহ-ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। লোকসংস্কৃতিবিদ্যার সঙ্গে অধিকাংশ সংগ্রাহকেরই কোনও পরিচয় ছিল না।

কেউ কেউ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সমীক্ষাও করেছেন। যেমন ১৩১২ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর 'পল্লীকথা' নামক রচনায় ঠকঠাকে উৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'বাঙালির মেয়ের ব্রতের কথা'-য় (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩১৩) সেঁজুতি ব্রতের আলোচনায় ছড়ার উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের 'গ্রাম্যছড়া' (ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৩) প্রবন্ধে প্রাদেশিক ভাষাচর্চার গুরুত্ব-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া 'মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা'-য় (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৫) ছড়াসহ মাঘমণ্ডল ব্রতের আলোচনা করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার 'মেয়েলী সাহিত্য' (প্রতিভা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১৮) প্রবন্ধে কয়েকটি ছড়া সন্নিবেশ করে মাঘমণ্ডল ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন। সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' (বামাবোধিনী, কার্তিক ১৩১৮) প্রবন্ধে রয়েছে ছড়াসহ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরিচিতি। বিভিন্ন ব্রত আমাদের দেশের বালিকাদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে কীভাবে সাহায্য করে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন নিরুপমা দেবী তাঁর 'পল্লী বালিকাদের উৎসব' (ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯) প্রবন্ধে। চাঁপা-চন্দন, সম্পদ নারায়ণ, হরিচরণ, অশ্বত্থ নারায়ণ, সেঁজুতি, যমপুকুর, দশপুতুল, তুষ তুষলা ইত্যাদি ব্রত এবং ব্রত-সংশ্লিষ্ট ছড়ার

উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুটনে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌষ-সংক্রান্তি' (প্রবাসী, প্রথম সংখ্যা ১৩১৯) প্রবন্ধে পাই পৌষ সংক্রান্তি ও মাঘমণ্ডল ব্রতের আলোচনা এবং ব্রতের ছড়ার উদাহরণ। ১৩১৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'গোকলব্রত' প্রবন্ধে রেণুকাবালা দাসী ছড়াসহ গোকলব্রত সম্পর্কে আলোচনা করেন। ওই পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় লেখিকা 'ব্রতমন্ত্র' প্রবন্ধে বিভিন্ন ব্রতের বিবরণ দেন এবং প্রাসঙ্গিক ছড়ার উল্লেখ করেন। সংগ্রহ-সমীক্ষার দৃষ্টান্ত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র ১৩১৯ সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিকের 'বাঘাইর বয়াত'। মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত ৬টি ছড়ার সহায়তায় তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৩৩৫-এর আশ্বিন সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন' প্রবন্ধে মোহাম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়ায় প্রতিফলিত পারিবারিক জীবনের রূপ-চিত্রণ করেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৪৬) প্রকাশিত ননীগোপাল দাসের 'পল্লীক্রীড়াগীতের আলোচনা'-য় ননীগোপাল দাস বিভিন্ন খেলা ও খেলা-সংশ্লিষ্ট ছড়ার সমীক্ষা করেন। সুশীলকুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৭০) গ্রন্থে উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত ৬২টি ছড়া বিশ্লেষিত হয়েছে। রেখা সিংহের 'মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষ' (১৯৮৪) গ্রন্থে মানভূম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ৩০টি ছড়ার সমীক্ষা লভ্য।

নিছক সমীক্ষাও কম হয়নি। উনিশ শতকের অন্তিম পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে-ছড়া-সমীক্ষা করেছিলেন তাতে ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘলালিত অবজ্ঞাজনিত মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে দেন। এ ধরনের সাড়া-জাগানো ছড়া-সমীক্ষা অবশ্য বাংলায় খুব অল্পই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে অবনীন্দ্রনাথ সেই সমীক্ষক, যাঁর সমীক্ষা অত্যন্ত উঁচুমানের। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (গ্রন্থাকারে প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫০)। 'বাংলার ব্রত'-এ ছড়াগুলিকে তিনি দেখলেন নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্রতের ছড়ায় যে-নাট্যধর্মিতা ও অভিনয়ধর্মিতা আছে তা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম দেখালেন। সদৃশ বা অনুকরণাত্মক যাদুবিশ্বাস কীভাবে ছড়াগুলিকে নাট্যগুণান্বিত করে তুলেছে তা অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় পাওয়া গেল। তাঁর মতে, ব্রত হল কামনামূলক অনুষ্ঠান। ছড়াগুলিতে সেই কামনার প্রতিধ্বনি। আর আল্পনায় কামনার প্রতিচ্ছবি। যাদুবিশ্বাস, ছবির কামনা বাস্তবে সত্য হয়ে উঠবে। ছড়াগুলিতেও সেই বিশ্বাসই ব্যক্ত।

১৩৩০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের গভীর রসবোধ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লভ্য। ছড়া যে চিত্ররূপময় সে-কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এই চিত্রময়তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি এই চিত্ররূপের মধ্যে গ্রামজীবন ও গ্রামীণ প্রকৃতিকে খুঁজে পেলেন। গ্রামজীবনের ল্যান্ডস্কেপ কীভাবে ছড়ায় ধরা পড়ে তা তিনি দেখালেন। ছড়ায় থাকে টুকরো টুকরো নানা ছবি। এ সমস্ত ছবির মধ্যে গ্রামজীবনের নানা প্রসঙ্গ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির উপস্থিতি। ছবিগুলির সাহায্য নিয়েই গ্রামজীবনে প্রবেশ করতে হবে।

অবনীন্দ্রনাথের মতে, ছড়াগুলিতে অতীত এবং বর্তমানের বিচিত্র সহাবস্থান। একটা

ছিল-র জগৎ, আর একটা আছে-র জগৎ। একদিকে কল্পনাজগৎ আর একদিকে বাস্তবজগৎ। ছড়ায় কল্পনা ও বাস্তবের বিচিত্র মিশ্রণ।

ছড়াগুলিতে রয়েছে ইতিহাসের বহু উপাদান। 'দেশকালের ছাপ পড়েছে অনেকগুলো ছড়ায়, যা থেকে ধরা যায় তাদের রচনার পরিষ্কার ইতিহাস।' দেশের অতীত ইতিহাস-সন্ধানে এ সমস্ত উপাদান যে আমাদের সহায়তা করে তাতে সন্দেহ নেই।

অবনীন্দ্রনাথের মতে, যে-সমস্ত ছড়ায় ভাবের প্রাসঙ্গিকতা নেই, সেগুলিই হল খাঁটি ছড়া। 'ছড়াগুলোর মধ্যে এক সুরে বলতে বলতে হঠাৎ আর এক সুরে আর এক কথা ধরা হচ্ছে অনেক জায়গায় এবং সেইটেই হচ্ছে ছেলেভুলানো ছড়ার আর্ট ও মজা।' ছড়ার মধ্যে তিনি Cubism-এর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন।

তিনি মনে করেন, বহু ক্ষেত্রেই দুটি বা ততোধিক ছড়ার অংশ মিশে গেছে। আর সেজন্যেই ছড়াকে অসংলগ্ন মনে হয়। 'একটার আগা গেছে অন্যটার শেষে, অন্যটার শেষ এসে জোড়া লেগেছে একটার আগায়। এই ছেলেভোলানো ছড়ার সম্পূর্ণ রূপটা ধরতে হলে এটার এক অংশ ওটায়, সেটার খানিক এটায় জুড়ে না দেখলে উপায় নেই, কাজটা ভারি শক্ত কিন্তু ভারি চিত্তাকর্ষক।' তাঁর এমনও মনে হয়েছে যে, 'ছড়াগুলিকে গুছিয়ে ধরার সময় এসেছে', এবং এভাবেই ছড়াগুলিকে সম্পূর্ণ করা যাবে। অর্থাৎ ছড়াগুলির পুনর্গঠনে তিনি বিশ্বাসী।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১৩৪৯) গ্রন্থে স্বল্প পরিসরে ছড়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মামুলি ধরনের আলোচনা। ছড়াগুলিকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। খেলার ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া আর বিবিধ ছড়া। বিবিধ ছড়ার মধ্যে শিব-দুর্গা-গোপাল-বিষয়ক ছড়া যেমন আছে, তেমনই আছে সাময়িক ও ব্যক্তিগত জীবন-আশ্রয়ী ছড়া, তুষলার ছড়া এবং ডাক ও খনার বচন।

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'সমীক্ষা' গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধে ছড়ার আলোচনা পাই। 'ব্রতের ফল' প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন ব্রতের বিবরণ দিয়েছেন এবং ব্রতের ছড়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্রতের মধ্যে নারীমনের বিকাশ লক্ষ করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রাম্যছড়া'য় এগুলির পারিবারিক পটভূমিটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করেছেন। কোনও কোনও ছড়ার সঙ্গে বাংলা ছড়ার সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। ছড়াগুলি বয়স্কদের জন্য এবং গেয়।

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'পূর্ববাংলার ব্রতকথা' (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৬) বস্তুতপক্ষে মাঘমণ্ডল ব্রতের আলোচনা। ব্রতের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতের নিয়মাদি আর আল্পনার উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রতের ছড়াও উদ্ধার করা হয়েছে। বিক্রমপুর ও বরিশালের মাঘমণ্ডল ব্রতের তুলনামূলক আলোচনা প্রবন্ধটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কামিনীকুমার রায়ের 'আমাদের লোকসাহিত্যে নারী' (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৮) প্রবন্ধে লোকগীতি-রূপকথা-গীতিকার পাশাপাশি ছড়ায় প্রতিফলিত নারীমনের স্বরূপটি ব্যাখ্যাত। হরিচরণ ও দশপুত্তল ব্রতের ছড়া উদ্ধৃত।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধে (বিচিত্র সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৩) সাধারণ কবিতার সঙ্গে ছড়ার যে-পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে তা অভিনিবেশের

দাবি রাখে। তাঁর মতে : 'ছেলেভুলানো ছড়া কবিতাই। তবে তার নির্মাণ-রীতি সাধারণ কবিতার থেকে আলাদা। সাধারণ কবিতা লেখবার সময় কবির কল্পনা বিচরণ করে ভাব থেকে রূপে, রস থেকে ভাষায়। ছড়া কবিতায় লেখকের কল্পনা যায় রূপ থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে, এবং তাতে রূপের ও ভাবের মধ্যে, ভাষা ও রসের সঙ্গে কোন রীতিসিদ্ধ যোগাযোগ বা সঙ্গতি আবশ্যিক নয়।' ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে মন্তব্যটি কথিত হলেও সমস্ত শ্রেণীর ছড়া সম্পর্কেই তা সত্য। মন্তব্যটিতে গভীর পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাই। ছড়ার ভাবগত অসংগতির কারণ খুঁজতে হবে রূপগত এই বিশেষত্বের মধ্যেই। তাঁর আর একটি মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য : 'ছড়ার প্রথম ছত্র রচনা হলেই যেন রচয়িতার দায়িত্ব শেষ, তারপর বাকিটা যেন আপনি গড়ে ওঠে।' উদাহরণ হিসেবে তিনি দুটি ছড়ার গড়ে-ওঠার ব্যাপারটি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, অন্ত্যমিলের আকর্ষণেই ছড়ার পঙক্তিগুলি পর পর বেড়ে ওঠে, যথাসময়ে শেষও হয়।

অধ্যাপক সেনের 'লোকসাহিত্যের ভাষা' (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, ১৯৭০) প্রবন্ধটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। প্রবন্ধটিতে ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি কোনও কোনও ছড়া-পঙক্তির অর্থোদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন, 'আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো' ছড়া-পঙক্তির 'বাটকৌড়ে'র অর্থ করেছেন 'বাট কড়িয়া'। অর্থাৎ, আট কড়াই অনুষ্ঠানে যে কড়ি বেটে দেয়। আবার, 'আঁটুল বাঁটুল সামলা সাঁটুল' পঙক্তিটিও অর্থহীন নয়। 'আঁটুল' মানে হাঁটু, 'বাঁটুল' মানে বর্তুল, 'সাঁটুল' মানে শক্ত সমর্থ। 'আঁদুলে কুঁদুলের মাসী কুলতলাতে বাসা'র 'আঁদুলে' স্থানবাচক শব্দ, আন্দুল থেকে আঁদুল। 'হলুদ বনে কলুদ ফুল' — পঙক্তির 'কলুদ' শব্দটি অর্থহীন নয়, 'কলম্ব' শব্দজাত। ছড়ার ভাষা নিয়ে অধ্যাপক সেনের আগে এভাবে আর কেউ ভাবেননি।

প্রসঙ্গত অধ্যাপক সেনের 'শিশুবেদ' প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রবন্ধটি ড. ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ছড়া' (১৩৭৭) সংকলনের ভূমিকা-প্রবন্ধ। যুগপৎ সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য প্রবন্ধে ছড়ার পর্যালোচনা করেছেন তিনি। ছড়াগুলিকে তিনি ছেলেমি ছড়া বলেছেন। তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন — ঘুমপাড়ানি, মনভোলানি ও খেলা চালানি। উদাহরণও দিয়েছেন। তাঁর মতে ছড়া হলো প্রাচীনতম সাহিত্য। 'তার যেমন ভাববীজ আছে, বস্তুবীজও আছে। এমনকী কোনো কোনো ছড়ায় সাহিত্যবীজও আছে' ছড়া কথাটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে তিনি যে-আলোচনা করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, "ছড়া শব্দটি পুরনো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা-ছত্রাংশ অর্থে শব্দটির ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর আগে পাইনি। তবে লোকব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই। সাধারণ লোকে গদ্য জানত না, 'পদ্য' অপরিচিত ছিল। মঙ্গল-গান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন-কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হল গান আর কবিতাছত্র অথবা কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই 'ছড়া' — শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থে। ১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত,ছড়ানো; ২) গ্রথিত, গাঁথা — মালা-ছড়া। গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত । এই ছিল তখন ছড়ার বিশেষত্ব। তার পরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দি 'ফুটকল' কবিতা আর সংস্কৃত 'চাণক্য' (চানা ভাজার মতো) শ্লোক ছড়ারই সমনাম।"

১৩৭২ সালের 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় ছড়া-প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, শৈলেন্দ্রনাথ সামন্তের 'বর্ধমানের লোক-সংস্কৃতি', সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের 'নদীয়ার লোকসংস্কৃতি', তারাপদ লাহিড়ীর 'মালদহের লোকসংস্কৃতি', প্রণয়কুমার কুণ্ডু-র 'বাংলার লোকসংস্কৃতি : জলপাইগুড়ি'।

দুলাল চৌধুরীর 'বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৩৭৬) এবং 'ছড়ায় বাংলার সমাজ ও ইতিহাস' প্রবন্ধে ছড়ায় প্রতিফলিত সমাজ ও ইতিহাস-চিত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে। তিনি মূলত জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির অনুসারী।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা দেশের সঙ প্রসঙ্গে' (১৯৭২) গ্রন্থে সঙের গানের সঙ্গে ছড়ার সমীক্ষাও যুক্ত। সমসাময়িক সমাজ-সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ কীভাবে ছড়ার উপজীব্য হয়ে ওঠে, উপভোগ্য রঙ্গরস সৃষ্টি করে, বীরেশ্বরবাবু তা দেখিয়েছেন। আমাদের সমাজ-ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান এ সমস্ত ছড়ায় রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের কাছে এসব উপাদানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ছেলেভুলানো ছড়ার সহায়তায় মাতৃমূর্তি অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে মা' গ্রন্থের (১৯৭৩) 'ছেলেভুলানো ছড়ায় মা' প্রবন্ধে। বিচ্ছিন্ন ছড়াগুলি থেকে একটি জননী-মূর্তি নির্মাণে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর সিদ্ধান্ত : 'ছড়ার মাতৃমূর্তি কৌতুকময়ী ও হাস্যোজ্জ্বল। মা এখানে পূর্ণকাম ও পরিতৃপ্ত। বুক জুড়ানো ধনকে নিয়ে উল্লসিত, উচ্ছলিত ও ধন্য। পরিতৃপ্ত জননীর এই হাসিভরা মুখখানি ছড়ার দর্পণে প্রতিবিম্বিত।' আলোচকের দৃষ্টি ভাববাদীর। সমাজতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বের আশ্রয় তিনি নেননি। ছড়ার রসোপভোগের অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগিয়েছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ থেকে।

'ফোকলোরচর্চার নবদিগন্ত' প্রবন্ধে অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসারী (সুচেতনা, ১৩৮৯)। Claude Levi-Strauss-এর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা-রীতির সাহায্য নিয়েছেন তিনি। বাংলার লোকসাহিত্য-ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ।

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের 'ছেলেভুলানো ছড়ার স্বরূপ, বিবর্তনধারা ও আঙ্গিকবিচার প্রসঙ্গে' (সারস্বত, শারদ সংখ্যা ১৩৯০) তাত্ত্বিক আলোচনা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টির সঙ্গে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। সমীক্ষার এই রীতি-পদ্ধতিটি প্রশংসাযোগ্য।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছড়ায় স্থান বিবরণ' গ্রন্থে (১৯৮৬) স্থানসম্পৃক্ত ছড়াগুলির আঞ্চলিক দিকটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনই সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দিকগুলিও গুরুত্ব পেয়েছে। জাতীয়তাবাদী মনোভাবই এ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত।

লোকসমাজে ছড়ার বিবিধ ভূমিকা। ছড়া যে শুধু চিত্তবিনোদন বা আনন্দদান করে থাকে তাই নয়, লোকশিক্ষাও দিয়ে থাকে। ছড়ার সামাজিক উপযোগিতার ব্যাপারটি উপেক্ষণীয় নয়। 'হেটো ছড়ায় লোকশিক্ষা প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনা করেছেন বীরেশ্বর

বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রাবণ-পৌষ ১৩৯৭, লোকসংস্কৃতি)। এ জন্য তিনি বিভিন্ন হেটো ছড়ার সংকলনের সাহায্য নিয়েছেন। আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এ সমস্ত ছড়ার বিশেষ স্থান আছে।

অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী, 'ঢেঁকির ছড়া ও ময়ূরপঙ্খীর গান' প্রবন্ধে অনালোচিত একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন (লোকশ্রুতি, দশম সংখ্যা ১৯৯৩)। নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত ঢেঁকির ছড়াগুলিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক মনোভাবের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজতাত্ত্বিকের কাছে তার গুরুত্ব কম নয়।

'লোকসংস্কৃতি-গবেষণা' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯৯৩) 'ছড়া : গঠনশৈলী' প্রবন্ধে নবেন্দু সেন ছড়ার গঠনশৈলীর বিশেষত্বগুলি নির্দেশ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে মানস মজুমদার ছড়ার রূপান্তর বা কথান্তরের স্বরূপ বিচার করেছেন (ছড়া: কামচারিতা কামরূপধারিতা)। ছড়া কীভাবে রাজনৈতিক প্রচার ও প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে ওঠে 'ছড়া : বিষয় রাজনীতি' প্রবন্ধে সৈয়দ মহম্মদ শাহেদ তা দেখিয়েছেন। ছড়ার ছন্দের স্বরূপ-প্রকৃতি পর্যালোচনা করেছেন নীলরতন সেন (ছড়া : ছন্দ-প্রসঙ্গ)।

ছড়ার ছন্দ বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নবকুমার কবিরত্ন ছদ্মনামে, ১৩২৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'মাতৃভাষা কি পেত্নীভাষা?' প্রবন্ধে। ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন সময়ে এ ছন্দ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন (দ্র. 'ছন্দ', সবুজপত্র, চৈত্র ১৩২৪। ভূমিকা, 'ছড়ার ছবি', আশ্বিন ১৩৪৪)।

'ছড়ার ছন্দ প্রাকৃতভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গিতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সবচেয়ে কম সহজ'।[৬]

পরবর্তীকালে দিলীপকুমার রায় (ছান্দসিকী, ১৩৪৭), প্রবোধচন্দ্র সেন (ছন্দ-পরিক্রমা, ১৯৬৫, ছন্দ-জিজ্ঞাসা ১৯৭৪, বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা ১৯৭৭), মোহিতলাল মজুমদার (বাংলা কবিতার ছন্দ ১৩৫২), অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ১৩৩৯), তারাপদ ভট্টাচার্য (ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন ১৯৭১), নীলরতন সেন (বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তা ১৯৮৯) প্রমুখ এ ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'উচ্চারণ' পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯৯৪) ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত। যেমন, ছড়ার ছন্দ : প্রয়োগ ও বিচার (সুধাংশুশেখর শাসমল), ছড়া : ছন্দ-প্রসঙ্গ (নীলরতন সেন), ছড়ার ছন্দে বৈচিত্র্য (রামবহাল তেওয়ারী)।

বাংলার লোকসাহিত্য-সমীক্ষায় সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে ছড়া। সমীক্ষকের তালিকাটি দীর্ঘ। মৌলিক চিন্তাভাবনা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অনেক সমীক্ষাতেই দেখা যায়।

বিশ শতকে বেশ কয়েকটি ছড়া-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'ছড়াছড়ি' (১৩৫৪) সচিত্র ছড়া-সংকলন। এতে রয়েছে ৩৩টি ছড়া। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিভিন্নজনের কাছ থেকে ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছেন। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর 'ছেলেভুলানো ছড়া' ৬০টি ছড়ার সংকলন (পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৮)। বিশেষ কোনও পরিকল্পনা নিয়ে এ সংকলন প্রস্তুত হয়নি। ছড়াগুলির কোনও শ্রেণীবিন্যাসও করা হয়নি। সংকলনের কিছু ছড়া রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত, কিছু ছড়া নতুন।

ভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া' (১৩৭৭) একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া-সংকলন। ছড়ার সংখ্যা ৮৭২। সেগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৮৮টি কথান্তর। এছাড়া ১৫০টি ধাঁধা সন্নিবেশিত। ছড়াগুলির কোনও শ্রেণীবিভাগ তিনি করেননি। প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমে পর পর সাজানো। সংকলনের শেষে আছে 'টীকা', 'দুরূহ শব্দার্থ', 'প্রথম ছত্রের সূচি' ও 'নির্ঘণ্ট'। টীকা অংশে ছড়াগুলির সংগ্রহ-উৎস নির্দেশিত। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ এবং অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আবদুল করিম, কুঞ্জলাল রায়, বসন্তরঞ্জন রায় প্রমুখের সংগ্রহ থেকে ছড়া যেমন নেওয়া হয়েছে, তেমনই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' (১৩০৬) সংকলন থেকেও ছড়া নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ছড়া আসানসোলের 'মহিলা বান্ধব' পত্রিকা থেকে গৃহীত। ব্যক্তিগত সংগ্রহও সংকলক ব্যবহার করেছেন। 'দুরূহ শব্দার্থ' অংশে দুরূহ শব্দসমূহের অর্থ জ্ঞাপিত। 'নির্ঘণ্ট' অংশে একটি মূল্যবান তালিকা পরিবেশিত। বিভিন্ন ছড়ায় অলংকার, আত্মীয়স্বজন, উৎসব, কাল্পনিক প্রাণী, কীটপতঙ্গ, খাদ্যবস্তু, খেলাধূলা, গ্রহনক্ষত্র, জীবজন্তু, দেবদেবী, নরনারী, পদবি, পোশাক-পরিচ্ছদ, পৌরাণিক নাম, ফুল, ফল, বাদ্যযন্ত্র, স্থান, বৃক্ষ, ব্যক্তিনাম, যানবাহন ইত্যাদির যে-উল্লেখ পাওয়া যায় তার তালিকা প্রদত্ত। সুকুমার সেন লিখিত ভূমিকা (শিশুবেদ) এ সংকলনের অতিরিক্ত আকর্ষণ।

পরবর্তীকালে ঈষৎ পরিবর্তিতাকারে 'বাংলার ছড়া' (১৯৯৭) নামে সংকলনটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কথান্তর ব্যতীত ছড়ার সংখ্যা ৯৩০। ধাঁধার সংখ্যা ১৪০। কথান্তরে পাই অতিরিক্ত ১২০টি ছড়া ও ধাঁধা। পরিশিষ্টে ১২টি সাঁওতালি ধাঁধা সন্নিবেশিত। এগুলি ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের 'কুদুম' (১৯৮২) থেকে গৃহীত। আলোচ্য সংকলনের কোনও কোনও ধাঁধার সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য আছে। টীকা, ধাঁধার উত্তর-সূচি, প্রথম ছত্রের সূচি, নির্ঘণ্ট যুক্ত হয়েছে। সুকুমার সেনের লেখা ভূমিকাটি (শিশুবেদ) এ সংকলনেও রয়েছে।

অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত ও সংকলিত 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় (১৪০২) ৫৬০টি ছড়া আছে। ছড়াগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত। উৎসগুলি হলো : শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ, অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা ১১৭। অবনীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা ১২৭। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা ৫৮। পরিশিষ্টে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ২৫৮টি ছড়া সন্নিবেশিত। এগুলির সংগ্রাহক বসন্তরঞ্জন রায়, কুঞ্জলাল রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আবদুল করিম। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) এবং অবনীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' (ভারতী, বৈশাখ ১৩৩০) প্রবন্ধ দুটি পুনর্মুদ্রিত

হয়েছে। আর আছে প্রাসঙ্গিক তথ্য, বর্ণানুক্রমিক সূচি (প্রথম চরণের)।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৬৯) যুগপৎ সংকলন ও সমীক্ষামূলক গ্রন্থ। এর আগে 'বাংলার লোকসাহিত্য' প্রথম খণ্ডের (১৩৬১) প্রথম অধ্যায়ে তিনি ছড়া সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনাটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত: সংজ্ঞা, লোকসংগীতের সঙ্গে পার্থক্য, বিভিন্ন বিভাগ, ছড়ার ছন্দ, ছড়ায় শিশু, নারী, প্রকৃতি। ছড়ার রসোপভোগের দিকটিই তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি সংকলন ও সমীক্ষার প্রতি সমান মনোযোগী। সংকলিত ছড়ার সংখ্যা ১১৯২। গ্রন্থটি সুপরিকল্পিত। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট ছাড়া আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকায় তিনি প্রাচীন ছড়ার রূপ, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ছড়া, ঠাকুর-পরিবার ও জাতীয় ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ ও তাহার বিশেষত্ব, লোকসাহিত্য বিচার, এবং ছড়ার বিশেষত্ব সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এরপর সাতটি অধ্যায়ে বিষয় অনুযায়ী ছড়াগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। শ্রেণীগুলি হলো : ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, খেলা, কন্যা, পরিবার, প্রাকৃত জগৎ, অতিপ্রাকৃত। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলিকে তিনি প্রসঙ্গোপকরণ (Motif) অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন : দোলনা, ঘুম আয়রে, ঘুম যারে, ঘুম যায়, বর্গী এল দেশে, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, নিদ্রালি মা। ছেলেভুলানো ছড়াগুলিও অনুরূপ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন : ভোজন, কান্না, নৃত্য, খোকা যাবে, বিয়ে, আয় চাঁদ, ধন ধন ধন, নন্দকিশোর, বিবিধ। খেলার ছড়াগুলি এক এক ধরনের খেলা অনুযায়ী সন্নিবেশিত। যেমন : আগডুম বাগডুম, ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি, হাডু-ডু, প্রশ্নোত্তরবাচক, বুড়াবুড়ী, বিবিধ। কন্যা-বিষয়ক ছড়াগুলি অধিবাস, তিন কন্যা, কন্যা আন, কন্যা দান, কন্যা বিদায়, জোড়পুতুলের বিয়ে, পরের ঘর, গুণবতী ভাই এবং প্রেম পর্যায়ে বিভক্ত। পরিবার-বিষয়ক ছড়াগুলি মা, মামা-মামি, জামাই, খুড়ো, বধূ, শাশুড়ি, ভাসুর এবং অন্যান্যদের নিয়ে রচিত। ছড়াগুলির শ্রেণীবিন্যাসে এসব আত্মীয়স্বজন গুরুত্বপ্রাপ্ত। শিরোনাম থেকেই তা বোঝা যাবে। যেমন : মা বড়ো ধন, মামা বাড়ি যাই, মামি কাটে সরু সুতো, তবু জামাই ভাত খেল না, খুড়ো দিল বুড়ো বর, বউ ভেঙেছে কাঁসা, শাশুড়ি মলো সকালে, গুণের ভাসুর ও অন্যান্য। প্রাকৃত জগৎ-বিষয়ক ছড়াগুলি বিবিধ পশু পাখি ও সরীসৃপ আশ্রয়ে রচিত : এক যে ছিল শিয়াল, বাঘে লইয়া যায়, অন্যান্য পশু, আয় আয় টিয়ে, ময়না ময়না ময়না, বিবিধ পাখি, মাছ ধরনে যাব। অতিপ্রাকৃত বিষয়ক ছড়াগুলিকে একদিকে মাস অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে, অন্যদিকে ঐন্দ্রজালিক লক্ষণ অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। যেমন : অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, অন্যান্য মাস, বারোমাসি; আয় রোদ, আয় বৃষ্টি, বসুন্ধরার ভোগ, শস্যের ছড়া, আম কুড়াইবার ছড়া, আড়ি কাটাইবার ছড়া, বাঘ নাচেব ছড়া। অষ্টম অধ্যায়ে সাহিত্যিক ছড়ার উদাহরণ ও বিশ্লেষণ। মৌখিক ছড়ার ঐতিহ্য সাহিত্যিক ছড়াকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা চিত্তাকর্ষক। পরিশিষ্টে 'খুকুমণির ছড়া' সংকলনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে-মূল্যবান ভূমিকা লিখেছিলেন সেটি সংযোজিত হয়েছে। সন্নিবেশিত হয়েছে কাছাড় জেলা থেকে সংগৃহীত দশটি ছড়া। এ ছাড়া রয়েছে বাংলা ছড়ার প্রথম সংগ্রহের নিদর্শন।

আলোচ্য সংকলনটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে কোনও সংকলনে বিষয় অনুযায়ী ছড়াগুলিকে এভাবে ভাগ করা হয়নি। ছড়ার শ্রেণীবিন্যাসে পরিণত চিন্তাভাবনা

ও সুগভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ছড়া-নির্বাচনেও অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিষ্ঠা ও মনোযোগের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সংগ্রহ থেকে প্রভূত সাহায্য নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বসন্তরঞ্জন রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, কুঞ্জলাল রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এবং তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ ব্যবহার করেছেন। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'প্রতিভা' (ঢাকা), 'সৌরভ' (মৈমনসিংহ), 'মাসিক মোহম্মদী', 'অর্চনা', 'উপাসনা', 'বসুধারা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকেও সাহায্য নিয়েছেন। সংগ্রহ ও নির্বাচনে তিনি যথেচ্ছ নন, যথাযথ। উভয় বাংলার ছড়াই আলোচ্য সংকলনে সন্নিবেশিত। সর্বোপরি ছড়াগুলির বিশ্লেষণ ও আলোচনায় তাঁর প্রশংসা করতেই হয়। প্রধানত ছড়ার রসসৌন্দর্য-বিশ্লেষণ তাঁর লক্ষ্য হলেও প্রয়োজনমতো ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। বাংলা ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ছেলেভুলানো ছড়াগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধ্যাপক ভট্টাচার্য বাংলা ছড়ার সমস্ত দিক স্পর্শ করেছেন। তাঁর আলোচনায় বাংলার লৌকিক ছড়াগুলি সম্বন্ধে সামগ্রিক একটি ধারণা তৈরি হয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিছক ছড়ার সংকলক নন, নিপুণ একজন রসব্যাখ্যাতাও। ছড়ার কথান্তরের ব্যাপারেও তিনি সচেতন। তাঁর গ্রন্থে ছড়ার কথান্তরের বহু দৃষ্টান্ত লভ্য।

বিমলকুমার মুখোপ্যাধ্যায়ের 'বাঙলার গ্রাম্য ছড়া' ১৯৭৪-এ প্রকাশিত। যুগপৎ সংকলন ও সমীক্ষা। ১৭টি ছড়া এতে সন্নিবেশিত। ছড়াগুলি হলো : শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি (ক), শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি (খ), কংসবাজার বদফরমাস, গোপাল নাচানো, বাঁশির সাপ হওয়া, কৃষ্ণকালী (ক), কৃষ্ণকালী (খ), গোষ্ঠ, রাধাকৃষ্ণের রাস, মানভঞ্জন, বিরহ, আগমনী, হরপার্বতীর কোন্দল, শিব-পার্বতীর বাগ্‌দি-বাগ্‌দিনির রূপধারণ, গাজন, রামসীতার বিবাহ, পদ্মিনী।

ছড়াগুলি ছেলেভুলানো ছড়ার মতো আয়তনে ছোটো নয়, তুলনায় বড়ো, আখ্যানধর্মী। ছড়াগুলিকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— পৌরাণিক ও লৌকিক। এ বিষয়ে সমীক্ষায় তিনি লিখেছেন : 'পৌরাণিক ছড়া তাকেই বলব যেগুলো পুরাণ-কথিত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। আর লৌকিক ছড়া পুরাণনিরপেক্ষভাবে লোককবির কল্পনা থেকে উৎসারিত'। তাঁর এই মত কতখানি গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। গ্রাম্যছড়াগুলিতে তিনি গল্পরস ও নাট্যরসের সন্ধান পেয়েছেন। 'টীকা'য় দুরূহ অংশ বা শব্দগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত, ১৯৭৯) সমীক্ষা ও সংকলন জাতীয় গ্রন্থ। সমীক্ষা খণ্ডটিতে রয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ছড়ার প্রাথমিক ও সাধারণ পরিচয় দান, ছড়ার কায়া ও কথাবস্তুর ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দিক ক্রিয়াশীল তার আলোচনা, ছড়ার স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবিন্যাস, ছড়া-পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণ নির্দেশ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংকলিত ছড়াগুলির সমীক্ষা। অধ্যাপক ভৌমিক আঙ্গিকবাদী সমীক্ষক। ছড়ার গঠনগত দিকটিই তিনি আলোচনার জন্যে বেছে নিয়েছেন। ছড়া-সমীক্ষার অন্য পদ্ধতিগুলি তিনি গ্রহণ করেননি।

অস্বীকারের উপায় নেই, ছড়ার গঠনগত দিক নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা তিনিই প্রথম করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ছড়ার সংকলন ও সমীক্ষার ইতিহাসের পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় খণ্ড সংকলন। ছড়ার সংখ্যা ৫২৫। প্রতিটি ছড়ার লিখিত অথবা মৌখিক উৎস তিনি নির্দেশ করেছেন। কথান্তর থাকলে তার উল্লেখ করেছেন। ছড়ার শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। ছড়াগুলিকে তিনি দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন — আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক ছড়াগুলি আবার তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় : বিবিধ বার্ষিক অনুষ্ঠান ; দ্বিতীয় পর্যায় : কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন; তৃতীয় পর্যায় : মানবজীবন ও জগৎ। অনানুষ্ঠানিক ছড়াগুলিকে পাঁচটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে —

১. মানবজীবন সম্পর্কীয় (প্রথম পর্যায় : ছেলেভুলানো ও শিশু সম্পর্কীয় ছড়া ; দ্বিতীয় পর্যায় : খেলা ও কৌতুক-বিদ্রূপের ছড়া; তৃতীয় পর্যায় : দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন ; চতুর্থ পর্যায় : কর্মজীবন ও অবসর যাপন; পঞ্চম পর্যায় : বৃত্তি-বিষয়ক)।

২ সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক (প্রথম পর্যায় : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিষয়ক; দ্বিতীয় পর্যায় : সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি-বিষয়ক; তৃতীয় পর্যায় : সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া; চতুর্থ পর্যায়: স্থানের খ্যাতি-কুখ্যাতি-বিষয়ক)।

৩. সাহিত্য-বিষয়ক (প্রথম পর্যায় : মধ্যযুগীয় ও উনবিংশ শতকীয়; দ্বিতীয় পর্যায় : বর্ণনা ও বিবৃতিমূলক ছড়া; তৃতীয় পর্যায় : কাহিনীর আভাসযুক্ত/অন্তর্ভুক্ত ছড়া)।

৪. নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া।

৫. বিচিত্র বিষয়ক।

অধ্যাপক ভৌমিক তাঁর সংকলনে পূর্ববর্তীদের সংকলনসমূহে ব্যবহৃত বহুল পরিচিত ছড়াসমূহ সাধ্যমতো বর্জন করেছেন। এর ফলে অনেক নতুন অথচ অপরিচিত ছড়ার সন্ধান আমরা যেমন পেয়েছি, তেমনি সাহিত্যমূল্যযুক্ত ছড়াগুলি বাদ পড়ায় সংকলনটির মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা' যে একটি বড়োমাপের কাজ তাতে সন্দেহ নেই। অধ্যাপক ভৌমিকের সমীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ছড়া' শব্দটির প্রতিশব্দ নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ছড়াকে নিছক শিশুসাহিত্য বা মেয়েলি সাহিত্য হিসেবে দেখেননি। তাঁর সংকলনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছড়ার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য এবং রূপগত ব্যাপকতার কারণে ছড়া যে প্রবাদ ধাঁধা ইত্যাদির অগ্রজ অধ্যাপক ভৌমিক এই ধারণারই বশবর্তী হয়েছেন। যদিও তিনি মনে করেন, লোকসাহিত্যের কোনও বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন নয়, একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। ছড়াকে অসংগত রচনা বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য, লোকসাহিত্যের কোনও বিভাগই অসংগতিতে পূর্ণ নয়। 'যে লোকমানস থেকে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা উৎসারিত হয়েছে, সেই একই লোকমানসের ফসল ছড়া। যদি অন্যান্য বর্গের নির্দশনগুলিতেও অর্থগত সঙ্গতি ও পারম্পর্য অনুপস্থিত থাকত, তবে ছড়ার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের একটি ভিত্তি থাকত।' ছড়ায় অনেক কথা বলা হয় আভাসে-ইঙ্গিতে, প্রতীক বা সংকেতের সাহায্যে। এই ইঙ্গিত প্রতীক বা সংকেতের অর্থোদ্ধার করতে পারলেই ছড়া আর অসংগত রচনা

বলে মনে হবে না। এদিক থেকে লোকচিত্রের সঙ্গে ছড়ার সাদৃশ্য নির্মলেন্দুবাবু লক্ষ করেছেন। 'ছড়ার বাক্যগঠন, পর্বসজ্জা ও বিন্যাস এবং অন্যান্য বাগ্‌ভঙ্গিতেও এই Abstraction-এর রীতি ক্রিয়াশীল।' নির্মলেন্দুবাবুর মতে ছড়ার কায়া-নির্মাণে যে-দিকগুলি গুরুত্ব পায় সে-দিকগুলি হলো, অন্ত্যমিল, প্রশ্নোত্তরমূলকতা, আহ্বান ও সম্বোধনমূলকতা, কোনও একটি দৃশ্য ঘটনা চরিত্র ও পরিস্থিতির বর্ণনা, কথা-কাহিনীর অবতারণা, ভাষা ও ব্যাকরণগত কিছু বৈশিষ্ট্য (শব্দের বিকৃতি, পদাশ্রিত নির্দেশক, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, পুনরাবৃত্তি, Antithesis, উপমা ইত্যাদি)। অধ্যাপক ভৌমিক ধাঁধা, প্রবাদ ও কথার সঙ্গে ছড়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি দৃষ্টান্ত সহায়তায় পরিস্ফুট করেছেন। ছড়ার সঙ্গে লোকনাট্যের যোগটিও দেখিয়েছেন। ছড়ার ছন্দ নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ছড়ার গঠনগত আলোচনায় অধ্যাপক ভৌমিক আর যে-দিকগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, সেগুলি হল Primary ও Secondary Motif, ছড়ার প্রথম-মধ্য-অন্তিম অংশ।

স্বীকার করতেই হয়, ছড়া-সমীক্ষা বা ছড়া-সংকলনে অধ্যাপক ভৌমিক গতানুগতিক নন। ছড়ার এমন অনেক দিক তিনি দেখিয়েছেন যা আমাদের জানা ছিল না। ছড়া-সমীক্ষার ক্ষেত্রটিকে তিনি প্রসারিত করেছেন, ছড়া-সমীক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

বিশ শতকের বাংলা ছড়ার সংগ্রহ-সংকলন-সমীক্ষা সম্পর্কে এখন কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বাংলার লোকসাহিত্যের এই শাখাটি অনেককেই আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের আলোচনার দ্বারা তাঁরা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অজস্র ছড়া সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা যে-নিষ্ঠা ও শিক্ষা নিয়ে লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে থাকেন তার অভাব অধিকাংশ সংগ্রাহকের মধ্যেই ছিল। সংগ্রহ-ব্যবস্থাটি যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত তা বলা যায় না। বড়োমাপের সংকলন খুব বেশি হয়নি। উল্লেখযোগ্য সংকলন তালিকায় রয়েছে আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড), ভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া' (পরিবর্তিত নাম : 'বাংলার ছড়া'), নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা'। সমীক্ষার সংখ্যা-প্রাচুর্য অনস্বীকার্য। কিন্তু অধিকাংশ সমীক্ষার সঙ্গেই বিদ্যা-শৃঙ্খলার কোনও যোগ নেই। বিচার-বিশ্লেষণের মান সন্তোষজনক নয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়ার আলোচনা অসাধারণ শুধু নয়, অনন্য। মহাকবির কলমে লোকসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ পৃথিবীর ইতিহাসেই দ্বিতীয় রহিত। আমাদের সৌভাগ্য যে, তিনি লোকসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, তিনি লোকসাহিত্যচর্চায় অনেককে আগ্রহী করে তুলেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি অধিকাংশ ছড়া-সমীক্ষককেই ভাববাদের জগতে বন্দী করে রেখেছেন। নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দীক্ষা নিয়ে যে লোকসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয় সে-কথা অধিকাংশ আলোচকই বিস্মৃত হয়েছেন। ফলে ছড়ার আলোচনা প্রায়শই সরল তরল অকিঞ্চিৎকর রচনায় পর্যবসিত হয়েছে। মৌলিকতার পরিচয়বাহী সমীক্ষার সংখ্যা তাই স্বল্প। অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এবং পরবর্তীকালের মযহারুল ইসলাম, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখের আলোচনা অবশ্য ব্যতিক্রম। কোনও একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সমন্বয় ঘটিয়ে ছড়ার আলোচনা করতে হবে। তবেই আলোচনা সমৃদ্ধ হবে। বাংলা ছড়া-সমীক্ষার

ধারাটি যে সে-দিক থেকে এখনও দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই। বিশ শতকের অধিকাংশ ছড়া-সমীক্ষক হয় ছড়ায় জাতীয়-জীবনের বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করেছেন, নতুবা ছড়ার কবিত্বময়তা ও রসমাধুর্য আস্বাদন করেছেন, কিংবা এক ছড়ার সঙ্গে অন্য ছড়ার তুলনা করেছেন। প্রথম দলটিকে বলতে পারি জাতীয়তাবাদী, দ্বিতীয় দলটিকে বলতে পারি ভাববাদী বা রসবাদী আর তৃতীয় দলটিকে বলতে পারি তুলনাবাদী। তুলনায় নৃতত্ত্ববাদী, মনঃসমীক্ষণবাদী, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বা আঙ্গিকবাদী সমীক্ষকের সংখ্যা স্বল্প। এখনও তাই অনেক কিছু বলার আছে। অনেক কিছু দেওয়ার আছে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৭, পৃ ১৬০।

২. 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে মুদ্রিত। প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের ১৬ আশ্বিন চৈতন্য লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পাঠ করেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি।

৩. শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটি 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে একত্রে 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' নামে প্রকাশিত।

৪. 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৩০৯ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'চট্টগ্রামী ছেলেভুলান ছড়া' প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন : 'মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ মহাশয়ের আহ্বানে চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল হইতে নিম্নপ্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। চেষ্টা করিলে এরূপ আরও অনেক ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য সত্যই আমাদের এই নিজস্ব সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের রক্ষণের জন্য আমাদের যে একান্ত যত্নপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে আর কথা কি?' পৃ ৭৬।

৫. প্রথম প্রকাশ : বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২। দ্র আত্মশক্তি ও সমূহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ৭২৯।

৬. ভূমিকা, 'ছড়ার ছবি', আশ্বিন ১৩৪৪। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ৪৯২।

৭. গ্রন্থঋণ :

১. ভট্টাচার্য আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯)।

২. ভৌমিক নির্মলেন্দু : বাঙলা ছড়ার ভূমিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৯)।

৩. চক্রবর্তী বরুণকুমার : বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস (১৯৮৬)।

৪. সিদ্দিকি আশরাফ : লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪)।